পাগ্‌লা মহেশ্বর

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, বি. এ.

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্‌-সি.
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম দশ আনা

বৈশাখ ১৩৪৮

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২৮।৪এ বিডন রো, কলিকাতা।

পাগ্‌লা মহেশ্বর

এক

মহেশ্বর !—দুষ্টু—পাজি—ব'স্ বল্‌ছি !—ব'স্, এক্ষুনি ব'স্। —বৈঠ্—বৈঠ্

ভোর হ'তে না হ'তে ছোট্ট মেয়ে বীণার কল-কণ্ঠের কথা কয়টি কানে যেতেই বোস্ সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটু উঁচু হয়ে বাংলোর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, বীণা তাঁর দাঁতাল হাতী মহেশ্বরের শুঁড় ধ'রে টেনে বসাতে চেষ্টা করছে। মহেশ্বর কিন্তু বেশ নির্ব্বিকার।

বীণার মা অন্য ঘর থেকে মেয়ের এই কাণ্ড দেখ্‌ছিলেন। হাতীটা একটু বেয়াড়া হলেও বীণাকে কিছু বলে না। বোস্ সাহেবের ঘরে এসে তিনি মেয়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—

দেখেছ মেয়ের কাণ্ড! কোন্ দিন হাতীতেই ওকে শেষ করে দেবে।

বোস্ সাহেব বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে জবাব দিলেন—

মহেশ্বরের কাছে অন্ততঃ ওর সে ভয় নেই। ওদের দু'জনের

খুব ভাব। অনেক সময় জন্তু-জানোয়ারের উপর মানুষের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করা যায়।

বীণা এতক্ষণে মহেশ্বরের শুঁড়ের মধ্যে এক তাল তেঁতুল গুঁজে দিল। মহেশ্বরও পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই তেঁতুলের তাল তার প্রকাণ্ড হাঁ র মধ্যে পুরে ফেল্‌ল। তখন তার ছোট ছোট সর্‌ষের মত চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে গেল। এর পর বীণা মহেশ্বরের শুঁড়ে হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ আদর ক'রে দৌড়ে বাংলোয় ফিরে এল।

বীণার আয়া সকালে হাতমুখ ধুতে গেছে, এই ফাঁকে বীণা মহেশ্বরকে তেঁতুল খাইয়ে এল। হাতীরা তেঁতুল খেতে খুব ভালবাসে। বীণা তাই প্রায়ই এমনি ক'রে মহেশ্বরকে তেঁতুল খাওয়ায়—এই ভাবে ছোট্ট একটি শিশু এবং প্রকাণ্ড একটা দাঁতাল হাতীর মাঝে বেশ চেনা-পরিচয় হয়েছে।

বীণার বাবা বোস্‌ সাহেব আসামের জঙ্গল থেকে কাঠ চালান দেন। মস্ত কারবার। তাঁদের কোম্পানীর অনেক-গুলো হাতী। মহেশ্বর ছাড়া তাঁদের আরও একটা বড় দাঁতাল হাতী আছে। তার কথা পরে বল্‌ব।

মহেশ্বরের বয়স্‌ সবে পনেরো বছর। সে সাত হাত উঁচু—তার ওজনও প্রায় একশো মণ। এখন সে এত বড় হ'লেও এক সময় বাচ্ছা ছিল। পাঁচ বছর পর্য্যন্ত সে একেবারে ছাড়া থাকৃত। তখনও তার পায়ে শিকল পড়ে নি; মার আশে-পাশে চ'রে বেড়াত; ভয় পেলে দৌড়ে তার মার চার পায়ের
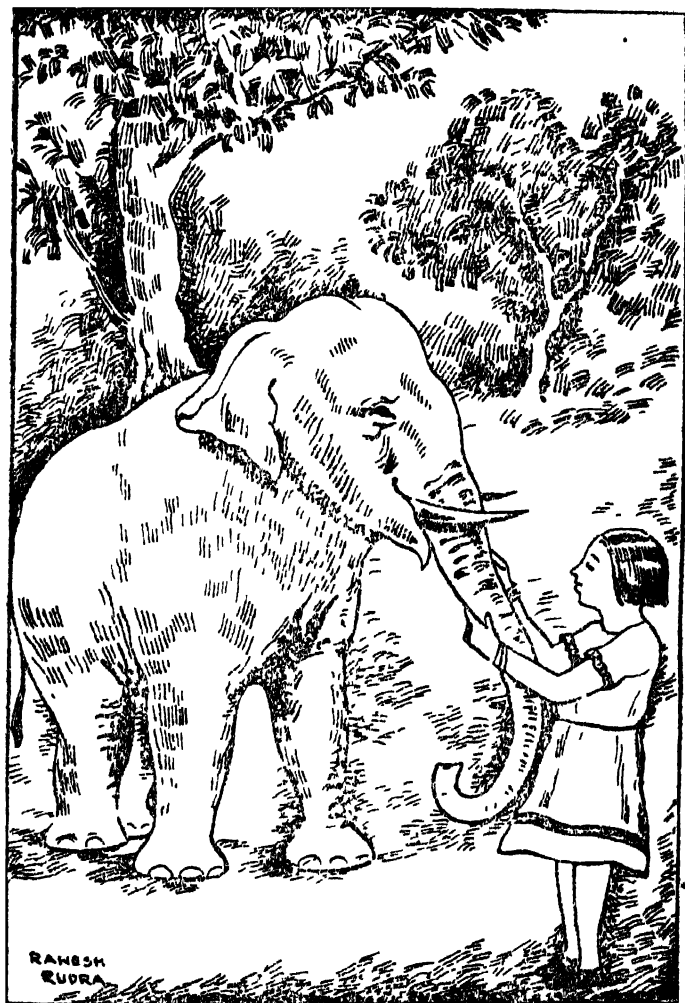
দুষ্টু—পাজি —ব'স্ বল্‌ছি।– ব'স, এক্ষুনি ব'স্।—১ম পৃষ্ঠা

আড়ালে পালিয়ে থাক্‌ত। মাকে ছেড়ে বেশী দূর যেতে সাহসে কুলাত না। রাত হয়ে এলে চারিদিকের জঙ্গল বাঘ-ভালুকের ডাকে গম্‌-গম্‌ ক'রে উঠ্‌ত, ভয়ে ভয়ে সে মার কোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঘের গোঁঙানি শুন্‌ত।

তিন বছর বয়সে ভিতরে ভিতরে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠে। মনে হ'ত কারখানার মানুষগুলোর চেয়ে তার গায়ের জোর বেশী হয়েছে। দুষ্টুমি ক'রে কখনও কখনও কোম্পানীর কুলী-মজুরদের তেড়ে যেত—তারাও ভয় পেয়ে পালাত—দেখে তার ভারী মজা লাগ্‌ত। একদিন গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে বোস্‌ সাহেবকেই তেড়ে গিয়েছিল। তাঁর হাতে একটা ডাণ্ডা ছিল, তাই দিয়ে তিনি মহেশ্বরের শুঁড়ে আচ্ছা এক ঘা কসিয়ে দিলেন। সেই থেকে সে আর কখনও ঐ খাকী হাফ্‌-প্যাণ্ট্‌-পরা, মাথায় টুপি, ডাণ্ডা-ধারী মানুষটাকে তাড়া করে নি। কিন্তু মনে মনে বেশ রেগে রইল।

এমনি ক'রে মহেশ্বরের বাচ্ছা-বেলার ছেলেখেলা শেষ হতে-না হতে এল মানুষের দাসত্বে ভর্ত্তি হবার শিক্ষানবিশীর পালা। সে দুঃখের কথা সে কোন দিনই ভুল্‌বে না।

এক পাল লোক হৈ হৈ ক'রে দড়ির ফাঁস ছুড়ে তার পা চারটে জড়িয়ে ফেল্‌ল। প্রথমটা সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌বার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর্‌ল—কুলীদের জনকয়েককে তাড়া করেও গিয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত তাকে বাঁধা পড়্‌তেই হ'ল—একটা বাচ্ছা হাতীকে কাবু করবার জন্যে লোকজন, দড়া-দড়ির প্রচুর

আয়োজন হয়েছিল। নিজে বোস্ সাহেব উপস্থিত থেকে সমস্ত তদারক করছিলেন।

এত আয়োজনের কারণ, তাকে প্রথম থেকেই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মানুষ যে-সে জীব নয়, তার কাছে জোর খাট্‌বে না। মানুষকে তার ভয় ক'রে চল্‌তে হবে—এই ভয় থেকেই তার দাস-জীবনের বর্ণপরিচয়।

মহেশ্বর একবার তার মার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ল, তারপর মানুষের শিশু ভয় পেয়ে যেমন ক'রে "মা-গো!—" ব'লে চীৎকার করে, তেমনি ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তার মা-ই বা কি করবে, আগে থেকে তাকে আচ্ছা ক'রে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অসহায় সন্তানের বিপদে তার কিছুই করবার উপায় ছিল না। বারকয়েক চীৎকার ক'রে সে শুধু তার নিরুপায় অবস্থার কথা জানিয়ে দিল। মহেশ্বর গায়ের জোরে বাঁধন ছিঁড়তে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগল।

চারটে পায়েই আলাদা আলাদা ক'রে শিকল পড়্‌ল। অনেকগুলো ক'রে লোকে এই এক-একটা শিকল ধ'রে, একটু একটু ক'রে টেনে এনে শিকল চারটে মোটা মোটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিল। এর পরে, তার কাছে কিছু খাবার জিনিস আর জল রেখে, সে-দিনের মত লোকজন সব চলে গেল।

দিন গেল,—রাত এল। রাত্রে মা-ছাড়া সে কখনও থাকে নি। চারিদিক্ অন্ধকার, রাত-চরা জন্তু-জানোয়ারের রকম-

বেরকম শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। সমস্ত দিনের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে শরীর ক্লান্ত। একে অনাহার, আবার মাও কাছে নেই; একটু ভয়-ভয়ও করছিল তার।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার সে শিকল ছিঁড়বার জন্যে মরিবাঁচি ক'রে টানাটানি করতে লাগল। যে রকম শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা তা' তার কেন, তার মারও ছিঁড়বার ক্ষমতা ছিল না। নিষ্ফল রাগের উন্মত্ত গর্জ্জন শেষে অসহায় শিশুর আর্ত্তনাদে পরিণত হ'ল। অন্ধকার বনের আর এক প্রান্ত থেকে সে আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আস্‌তে লাগল—মা তবুও কাছে এল না।

পরদিন সকাল হতেই বোস্ সাহেব মহেশ্বরকে দেখ্‌তে এলেন। খাবার জিনিস যা তার কাছে রেখে যাওয়া হয়েছিল, তার কিছুই সে ছোঁয়নি। আধ-মরার মত ধুঁক্‌ছে, আর ভাঙ্গা-গলায় মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে। বোস্ সাহেব টাট্‌কা ঘাস, আখ, তেঁতুলের তাল সঙ্গে এনেছিলেন। শুঁড়ের কাছে এগিয়ে দিলেন—মহেশ্বর খেল না। খিদে যথেষ্ট থাক্‌লেও রাগে দুঃখে তার খাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না।

আরও একদিন এইভাবে কাট্‌ল। সে আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। বোস্ সাহেবের ভাবনা হ'ল, বেয়াড়া বাচ্ছাটাকে হয়ত পোষ মানানো যাবে না। এমন সুন্দর বাচ্ছাটি পোষ মানানোর চেষ্টায় হয়ত মরেই যাবে।

এ দিন এসে তিনি একটা পাত্রে খানিকটা টিনের ঘন দুধ

জলের সঙ্গে মিশিয়ে তার কাছে রেখে গেলেন। তিনি চলে গেলে, মহেশ্বরের শুঁড়টা অন্যমনস্ক ভাবে দুধের পাত্রের দিকে এগিয়ে এল। পিপাসা পেয়েছিল খুব—এক চুমুক দুধ শুঁড় দিয়ে চুষে নিল—তারপর আস্তে আস্তে মুখের মধ্যে ঢেলে দিল। খেতে বেশ লাগ্‌ল। আরও এক চুমুক—শেষে সমস্ত দুধটাই খেয়ে ফেল্‌ল।

দুধটা খেয়েছে দেখে বোস্ সাহেব খুশী হলেন।-তা হ'লে বাচ্ছাটাকে পোষ মানানো যাবে, বোধ হচ্ছে। পরক্ষণেই কিন্তু মহেশ্বরের কাতর-করুণ চোখের দিকে চেয়ে তাঁর ধারণা বদলে গেল। তার সমস্ত আকৃতি-প্রকৃতি বলে দিচ্ছিল যে, সে শরীরে ও মনে খুবই ভেঙ্গে পড়েছে।

বাচ্ছা হাতীর শরীর ভেঙ্গে পড়্‌লে তত ভয়ের কথা নয়—রীতিমত খাওয়া-দাওয়া পেলে সেরে ওঠে। কিন্তু, মন ভেঙ্গে গেলে বাঁচান শক্ত। তক্ষুনি তিনি মহেশ্বরের শিকল খুলে দিতে বল্‌লেন। চার পায়ের শিকল খুলে দিয়ে সামনের দুই পায়ে বেড়ি-শিকল লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল—যাতে সে ছুটতে না পারলেও কাছাকাছি যায়গায় ইচ্ছেমত চ'রে খেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরের চিকিৎসার ব্যবস্থাও হল। এখানকার জঙ্গলে হাতীর বৈদ্য পাওয়া যায়। তারা জংলী লোক, খাবার জিনিসের সঙ্গে নানা রকম গাছ গাছড়া খাইয়ে চিকিৎসা করে। সে চিকিৎসায় বেশ ফলও হয়।

দুই

বোস্‌ সাহেবের বক্‌শিসের লোভে, ঐ অঞ্চলের একজন নামকরা হাতীর বৈদ্য খুব যত্ন ক'রে তার চিকিৎসা আরম্ভ করল। ভাল ভাল খাবারের সঙ্গে এ-গাছের শিকড় ও গাছের ছাল খাওয়াতে খাওয়াতে মহেশ্বরের চেহারা একটু একটু ক'রে ফিরতে লাগল—কয়েক মাসের মধ্যেই সে বেশ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল।

সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাহুত মংলা, তাকে একটু একটু ক'রে মানুষের চাকরি করা শেখাতে সুরু করলে। মংলা তার মাথার উপর ডাঙ্গস্‌টা কখনও আস্তে, কখনও একটু জোরে চেপে ধরে। মহেশ্বর ডাঙ্গসের খোঁচা এড়ানর জন্যে ভয়ে ভয়ে মাথা নীচু করে। মহেশ্বর মাহুতের হুকুমে পিছনের পা দু'টো গুটিয়ে বসতে শিখ্‌ল।—চলতে বললে চলে, থামতে বললে থামে। পিঠের উপর হাল্‌কা হাল্‌কা হাওদা বেঁধে দিলেও আপত্তি করে না। সে জানে, আপত্তি করলেই ডাঙ্গসের খোঁচা খেতে হবে।

প্রথমে ছোট হালকা হাওদা, ক্রমে ভারি বড় হাওদা তার পিঠে উঠ্‌ল। দশ বছর বয়সে সে কোম্পানীর আর-সব সমান বয়সী হাতীর তুলনায় বেশ বড়ই দেখতে হ'ল।

মহেশ্বরের দাঁত দুটো বাঘের পাঁজরায় বিঁধে গেল। —১০ পৃষ্ঠা

এই সময়, এই বাচ্ছা বয়সেই সে একটা বাঘ মেরে ছিল। যখন সে আরও ছোট ছিল, বাঘ দেখলে ভয় পেত,—প্রকাণ্ড চারটে থামের মত মার পায়ের মাঝখানে পালিয়ে যেত। তার মাকে সে কখনও বাঘ মারতে দেখে নি। তা' হ'লেও সে বড় হয়ে কেমন ক'রে যেন নিজেথেকে বুঝতে পারল ঐ হলদে ডোরাদার বাঘ নামের প্রকাণ্ড বেড়াল সে মারতে পারে, যেন বাঘ মারতে পারা তার জাতের স্বভাব।

রাতের বেলায় তার সামনের দুই পায়ে বেড়ি-শিকল লাগিয়ে রাখাছিল। বাঘটা পিছন দিক্ থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিল পিঠের উপর। ধারালো নখ-দাঁতের আঁচড়-কামড়ে তার সমস্ত শরীর যখন জ্বালা করে উঠ্‌ল তখন সে প্রাণপণে গা-ঝাড়া দিয়ে বাঘকে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু বাঘ তখনি দাঁড়িয়ে উঠে মহেশ্বরের সামনের পা বেয়ে কাঁধ পর্য্যন্ত উঠে গেল। তার কান আঁকড়ে ধ'রে মুখের পাশে মস্ত মস্ত নখ বিঁধিয়ে দিল। বেচারা মহেশ্বর এবার সত্যিই কাবু হয়ে পড়ল। সে-যাত্রায় বাঘ তাকে হয়ত মেরেই ফেল্‌ত, কিন্তু মহেশ্বরের কপাল-জোরে অবস্থাটা পাল্‌টে গেল।

মহেশ্বরের সামনের দুই পায়ে বেড়ি-শিকল বাঁধা ছিল। সেই অবস্থায় সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে, পা যে তার শিকল দিয়ে বাঁধা সে কথা ভুলে, বে-পরোয়া ছুট দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে পড়্‌ল একেবারে বাঘের উপর চেপে। আর সেই হুমড়ি-খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরের দাঁত

দুটো বাঘের পাঁজরায় বিঁধে গেল। এবার মহেশ্বরের পালা। সে রাগের চোটে বাঘটাকে দুই পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে এমন থেঁত্‌লে মাটির সঙ্গে সমান ক'রে দিল যে, তাকে আর তখন বাঘ ব'লে চিনবার জো থাক্‌ল না।

পরের দিন সকালে বোস্‌ সাহেব মহেশ্বরকে দেখতে এসে দেখেন এই কাণ্ড। বাঘ ত' মরেছে। কিন্তু, মহেশ্বরের সমস্ত গায়ে যে আঁচড়-কামড় দিয়েছে সেইগুলোই এখন তাঁর ভাবনার কথা; কেন না, বাঘে যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার মেরে খায়, তাদের রক্ত মাংস বাঘের দাঁতে নখে কিছু কিছু লেগে থাকে। সেই রক্ত-মাংস পচে, তাতে নানা রকমের বিষাক্ত জীবাণু জন্মায়। হিংস্র জন্তুর আঁচড়-কামড়ের ঘা এই জন্যে প্রায়ই বিষিয়ে যায়।

মহেশ্বরের চিকিৎসার জন্যে আবার বৈদ্য ডাকা হ'ল। গাছ-গাছড়া দিয়ে সিদ্ধ জলে রোজ ঘা ধোয়ানো চল্‌তে লাগ্‌ল—ঘায়ের উপর মাছি না বসতে পারে তার জন্যে কত রকম প্রলেপ দেওয়া হল। দু' মাস ধ'রে যত্ন-তদ্বিরের ফলে, আর বৈদ্যি ম'শায়ের গাছ-গাছড়া জড়ি-বুটির গুণে ঘা শুকিয়ে গেল। তবু সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে মহেশ্বরের আরও এক মাস লেগেছিল।

তিন

বোস্‌ সাহেবের আরও একটা মস্ত দাঁতাল হাতী ছিল, তার নাম ভৈরব—সে একটা দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা। প্রায়ই তার মেজাজ খারাপ হয়। তখন সে যাকে সামনে পায় তাকেই ঘায়েল করে। এই সময় তাকে মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়।

বাচ্ছা বয়সে মহেশ্বর একবার এই ভৈরবের পাল্লায় পড়েছিল। কারখানার কুলী-মজুররা নিকটে না থাকলে মহেশ্বরকে সে হয়ত মেরেই ফেল্‌ত। সেই থেকে মহেশ্বর আর ভৈরবে রেশারেশি চলেছে—কেউ কাউকে বরদাস্ত করতে পারে না। বাচ্ছা মহেশ্বর ভাবে বড় হয়ে সে ভৈরবের উপর শোধ তুলবে।

বয়স্‌ যখন উনিশ, সেই সময় মহেশ্বরের জীবনে একটা ঘটনা ঘটে—সেই থেকে তার মনটা ভিতরে ভিতরে স্বাধীন হবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। রাতে সে যেখানে বাঁধা ছিল—তারই খানিকটা দূর দিয়ে একটা বুনো হাতীর দল চলে গেল। দিব্বি আরামে চ'রে বেড়াচ্ছে। একটু একটু ক'রে সমস্ত দলটাই শেষে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মহেশ্বর তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ল। দেখতে দেখতে মনটা কেমন এক রকম হয়ে গেল। এরা ত' তারই জাত ভাই। কেমন স্বাধীন! পায়ে শিকল নেই, মাথার উপর মাহুত নেই—মানুষের চাকর নয়।—একদিন

সেও ওদেরই মত স্বাধীন হবে। মানুষের চাকরি তার মোটেই ভাল লাগে না।

এই ঘটনার পর থেকে একদিকে তার ভিতরকার প্রকৃতি তাকে স্বাধীন হওয়ার জন্যে নাড়া-চাড়া দিতে লাগল, আর এক দিকে মানুষ-জন্তুর উপর রাগও তার বেড়ে চল্‌ল। সে ভাবে কোম্পানীর সমস্ত মানুষগুলোকে একদিন মেরে ফেল্‌বে—তার পর বনে চ'লে যাবে। সেখানে সে নিজের ইচ্ছে মত চ'রে বেড়াবে। মানুষ কি ভয়ানক জন্তু—একটু বেয়াড়া হলেই মাহুত তাকে কি জোরে ডাঙ্গস লাগায়!

দিনের বেলায় খাটা-খাটুনি। ছে-দেওয়া মোটা মোটা গাছ গড়িয়ে এনে কারখানা-জাত করে—আর রাতের বেলায় বেড়ি পরে এদিক ওদিক চ'রে খায়। ছাব্বিশ বছর বয়স্‌। যেমন প্রকাণ্ড তার চেহারা তেমনি অসম্ভব গায়ের জোর। দশটা হাতী যে কাজ ক'রে উঠতে পারে না. একা মহেশ্বর অনায়াসে তা ক'রে থাকে। তবে এক দোষ ভৈরবকে দেখলে সে একেবারে ক্ষেপে যায়। বোস্‌ সাহেব হুকুম দিয়েছেন মহেশ্বর আর ভৈরবকে কখনও যেন কাছাকাছি রাখা না হয়।

এই সময় মহেশ্বরকে কেনবার জন্যে খদ্দের জুটেছিল। বোস্‌ সাহেব বিক্রী করেন নি। তাঁর কাঠের কারখানার ক্রোশ দুই দূরে এক পশ্চিমা কেঁইয়ার ধানের কারবার। কারবারের মালিক নাথুরাম একে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু বোস্‌ সাহেব কিছুতেই মহেশ্বরকে বিক্রী করতে রাজি হন নি। ছোট থেকে সে তাঁরই

হাতে বড় হয়েছে। মহেশ্বরের উপর তাঁর একটা মায়া প'ড়ে গেছে। তা ছাড়া মহেশ্বরের মত এত বড় দাঁতাল হাতী সাধারণতঃ দেখা যায় না।—এমন হাতী কি কেউ সামান্য টাকার লোভে অন্যের হাতে দেয়!

নাথুরাম বোঝে কিসে টাকা হয়। টাকা রোজগারের জন্যে নিজের দেশ ছেড়ে আসামের জঙ্গলে কারবার করতে এসেছে। হাতীটা যদি কিনে রাখতে পারে দু-পাঁচ বছর পরে বেশ মোটা লাভে বিক্রী করা যাবে। বোস্‌ সাহেব মহেশ্বরকে বিক্রী করলেন না। নাথুরাম সেই থেকে মতলবে আছে যে, কোনও রকমে বোস্‌ সাহেবকে জব্দ করবে। লোক লাগিয়ে মহেশ্বরকে এমন যখম ক'রে দেবে যে, কেউ আর তাকে কানাকড়ি দিয়েও কিনতে চাইবে না।

নাথুরাম বোস্‌ সাহেবকে জব্দ করবার এক অদ্ভুত ফন্দী এঁটে, মহেশ্বরের মাহুত মংলাকে গোপনে ডেকে পাঠাল।—এ লোকটাও খুব দুষ্টু।

মংলা এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ালে নাথুরাম তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে বোস্‌ সাহেবের কাছে কত টাকা মাইনে পায়।

মংলা বলল—পনেরো, শেঠজি।

শেঠজি, অর্থাৎ নাথুরাম আশ্চর্য্য হবার ভাব দেখিয়ে বলল—মাত্র পনেরো! তা' এই পনেরো টাকায় তোমার কি ক'রে চলে?

মংলা, মাইনে সম্বন্ধে বোস সাহেবের অবিচার, নিজের দক্ষতা এবং সেই সঙ্গে অভাব অভিযোগের একটা লম্বা ফর্দ্দ দিতে

যাচ্ছে, এর মধ্যে নাথুরাম বলল—তোমার মত পাকা মাহুত, বিশ টাকা কেন পঁচিশ টাকা দিয়েও পাওয়া কঠিন।

মংলা যে পাকা মাহুত, নিজে বোস্‌ সাহেবও সেকথা স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু তাই ব'লে পনেরো টাকার জায়গায় এক-লাফে পঁচিশ টাকা মাইনে হ'তে পারে, এরকম কথা শুনে তার মনটা বেশ গলে গেল। কিন্তু সেও চালাক কম নয়—সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হ'ল এভাবে কথা বলার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। তা না থাকলে ছাতুখোর কেঁইয়া খামখা এত দরদ দেখাতে যাবে কেন।

মংলা কোন কথা বলছে না দেখে, নাথুরাম বলল—মণিপুরের এলাকায় সে হাতী কেনা-বেচার কাজ আরম্ভ করবে, মংলা যদি রাজি হয়, তা হ'লে এখনই তাকে পঁচিশ টাকা মাহিনের কাজে ভর্ত্তি করতে পারে।

মংলা সহজেই রাজি হ'ল। নাথুরাম এইবার তাকে আসল কথা ভেঙ্গে বলল। কথাটা এই—

বোস সাহেবের কাজ ছেড়ে দিয়ে, নাথুরামের চাকরিতে ভর্ত্তি হ'লে এখনই সে পঁচিশ টাকা করে মাইনে পাবে। তবে তার আগে তাকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। মহেশ্বরের দাঁত দুটো কেটে আনতে হবে। বন্দোবস্ত যা কিছু করা দরকার নাথুরাম করে দেবে। একটু হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করলেই ধরা পড়ার কোন ভয় নেই। মতলবটা এই—

বিকেলের দিকে মহেশ্বরের স্নান হয়ে গেলে, মংলা তাকে কারখানার বাংলো থেকে খানিক দূরে শিকল পরিয়ে রাখবে। তারপর বেশ অন্ধকার হয়ে এলে নাথুরাম দু'জন লোক পাঠিয়ে দেবে। তাদের কাছে ভাল ধারাল করাত থাকবে। দাঁত অবশ্য মংলাকেই কাটতে হবে। সে ছাড়া আর কেউ ও-হাতীর কাছে ঘেঁসতে পারবে না। দাঁত কাটা হয়ে গেলেই নাথুরামের লোক দাঁত নিয়ে জঙ্গলের মাঝে কোনও একটা গাছের কাছে মাটিতে পুঁতে রেখে দেবে।

ওজর আপত্তি দর-কসাকসি হ'ল অনেক। তবে টাকার জোরে না-হয় এমন কোন্ অপকর্ম্ম আছে ? টাকার লোভে মংলা শেষে রাজি হ'ল। এর জন্যে তাকে বকশিস করতে হবে পুরো একশো টাকা। নাথুরাম সেই দিনই তাকে পঞ্চাশ টাকা আগাম দিল—বাকী টাকা কাজ হাসিল হলে পাবে। এ ছাড়া পঁচিশ টাকা মাইনের নতুন চাকরিটা ত' আছেই।

এইবার বোস্ সাহেব খুব জব্দ হবেন ভেবে নাথুরামের মনে ফুর্ত্তি আর ধরে না। দাঁত কেটে নিলে মহেশ্বর একেবারে অকেজো হয়ে যাবে। তারপর দুই-এক বছর কেটে গেলে, সমস্ত ব্যাপারটা যখন চাপা প'ড়ে যাবে, মাটির নীচে থেকে দাঁত দুটো তুলে এনে মোটা দামেই বিক্রী হবে।

পুরুষ হাতী বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে শুঁড়ের দুই পাশের দুটো "ছেদ-দন্ত" বড় হতে থাকে। এই দাঁতকে আমরা গজদন্ত বলি। দাঁত যত বড় হয় তার দামও তত বেশী

হয়। দাঁতাল হাতী তার দাঁতের জন্যে কেবল যে দেখতেই সুন্দর হয় তা নয়, এই দাঁতের জোরে সে অনেক-কিছু কাজও করে থাকে।

হাতীর আর একটা অদ্ভুত জিনিস তার শুঁড়। হাত এবং নাক এক সঙ্গে মিলিয়ে যেন এই শুঁড় তৈরী হয়েছে! শুঁড়ের আগায় দুটো ছেঁদা আছে, তাই দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। আর শুঁড় দিয়ে না করতে পারে এমন কাজ নেই। জোরের কাজ ত করতে পারেই—একটা ছোট ছুঁচ পর্য্যন্ত মাটি থেকে খুঁটে তুলতে পারে।

চার

বেলা প'ড়ে এসেছে। বিকেল হ'তে আর দেরী নেই। বাংলোর বারান্দায় ঈজি চেয়ারে শুয়ে বীণা দূরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখতে দেখতে, অন্যমনস্ক হয়ে, চেয়ার ছেড়ে বারান্দার রেলিং ধ'রে এসে দাঁড়াল। কি মনে হ'ল—মাথায় একটা টুপি চাপিয়ে আস্তে আস্তে নেমে, সামনের উঠোন পার হ'য়ে এগিয়ে চল্‌ল।

মাঝে মাঝে সে এই রকম বাইরে বেরিয়ে যায়। কারখানার চারিদিকেই লোকজন এবং কুলী মজুরদের বস্তি। এক মাইল দেড় মাইলের মধ্যে দিনের বেলায় হিংস্র জন্তুর ভয়ও নেই। তা' হ'লেও বোস্‌ সাহেব ব'লে দিয়েছেন বীণা যখন বাংলো থেকে বাইরে যাবে, চারজন কুলী যেন তার সঙ্গে থাকে।

আজ সে কাউকে সঙ্গে না নিয়েই চুপি চুপি বেরিয়ে গেল—এই ভেবে যে, এক্ষুনি ফিরে আসবে। হাঁটতে হাঁটতে বাংলো ছাড়িয়ে খোলা মাঠের কাছে এল। মাঠের আর এক ধারে মোটা শেগুন গাছের সঙ্গে পাগ্‌লা হাতী ভৈরব বাঁধা ছিল—ক'দিন থেকে তার মেজাজ-খারাপ চলছে। বীণা মহেশ্বরকে যেমন ভালবাসে ভৈরবকে তেমনি ভয় করে।

আগের দিন তার বাবার কাছে শুনেছে ভৈরব ক্ষেপে আছে। শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল, ভয়ের কোন কারণ ছিল না, তবুও মাঠের যে দিক্‌টায় সে বাঁধা ছিল, সে দিকে না গিয়ে বীণা অন্য দিকে এগিয়ে চল্‌ল। মাঝে মাঝে ভৈরবের গুরু-গম্ভীর হুঙ্কার কানে আসছিল, তাই শুনে বীণার কেমন ভয়-ভয় করছিল।

অনেকক্ষণ সে এইভাবে এগিয়ে গেল। হল্‌দে পাখী, মাছরাঙ্গা, বনটিয়ে, ফিঙ্গে—কত রকম পাখী, তাদের যে কত রকম-বেরকম ডাক! চমৎকার লাগছে। শুক্‌নো পাতা ঝ'রে পড়ার সর্‌-সর্‌ শব্দ, মাথার উপর গাছের ডালে বাঁদরের কিচির-মিচির, এই সমস্ত শুন্‌তে শুন্‌তে ভৈরবের ভয় কোন্‌ সময় মিলিয়ে গেল। বীণা আরও এগিয়ে চল্‌ল।

ফেরবার কথা যখন মনে হ'ল তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে—গরম কিন্তু তেমন কমে নি, কেমন যেন গুমোট থম্‌থমে ভাব—ঝড় উঠবে হয়ত। গরম কালে ঝড় ওঠবার আগে সাধারণতঃ এই রকম হয়। মোটের উপর আকাশের গতিক ভাল নয়।

শিকলের ঝমর্‌-ঝমর্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। নিকটে বোধ হয় পোষা হাতী চ'রে বেড়াচ্ছে। বীণা ভাব্‌ল, মহেশ্বরকে যদি পাওয়া যায় ত বেশ হয়,—তার পিঠে চেপে তাড়াতাড়ি বাংলোয় পৌঁছে যাওয়া যায়। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখ্‌ল—কতকগুলো কোম্পানীর হাতী চরছে—কিন্তু মহেশ্বর সেখানে নেই।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ক'রে ঝড় উঠ্‌ল। আকাশের কড়-কড় শব্দে বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠ্‌ল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের মাথায় মাথায় ঝড়ের গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা বীণার গায়ের উপর পড়ছে। এইবার সে দৌড়তে আরম্ভ করল। একটা বড় গাছের ডাল মড়্‌মড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে পড়্‌ল—বীণা আর একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে ছুটে গেল।

সে ছুটেছে—ঝড়বৃষ্টি অন্ধকার এক সঙ্গে ঘনিয়ে এসেছে—তাড়াতাড়ি বাংলোয় না পৌঁছতে পারলে বিপদের কথা। দৌড়তে দৌড়তে একটা মোড় ঘুরতেই দেখল একটু দূরেই একটা দাঁতাল হাতী—কি সর্ব্বনাশ!—এ ত মহেশ্বর নয়—ভৈরব! যে গাছের সঙ্গে তার শিকল বাঁধা ছিল, সে গাছটা উপড়ে পড়েছে। ভৈবর ছাড়া পেয়ে রুখে চলেছে। যদি তাকে তেড়ে আসে! বীণা আর ভাবতে পারল না—ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। তবুও সে ভৈরবকে এড়িয়ে এঁকে-বেঁকে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। ভৈরব বীণাকে দেখতে পেয়েছিল, সে পায়ের শিকল টানতে টানতে বীণাকে তাড়া করে এল।

এঁকে-বেঁকে দৌড়ে, কখনও গাছের আড়াল দিয়ে ঘুরে বীণাও ছুট্‌ল—তার সমস্ত শরীর কাঁটা গাছে ছ'ড়ে যাচ্ছে।

শরীরের তুলনায় হাতীর ঘাড় ও চোখ ছোট। তাই তার সমস্ত শরীর না ঘুরিয়ে সে ঘাড় ফেরাতে পারে না। এই জন্যে সামনে ছাড়া আশে-পাশে এরা ভাল ক'রে দেখতে পায়

বীণা পালাচ্ছে—ভৈরব তাকে তাড়া ক'রে চলেছে। ২২ পৃষ্ঠা

না। চোখেও কম দেখে। কিন্তু চোখে কম দেখতে পেলেও শত্রুর গন্ধ পায়। বাতাস-চলার এক মাইল দেড় মাইল তফাতের শত্রুকেও এরা বুঝতে পারে। চলতে চলতে সন্দেহ হ'লে শুঁড় উঁচু ক'রে বার বার বাতাস শুঁকতে থাকে। সেই জন্যে হাতীর দিক্ থেকে বাতাস চল্‌তে থাকলে সে বাতাস শুঁকে এরা কিছু বুঝতে পারে না।

বীণা পালাচ্ছে—ভৈরব তাকে তাড়া ক'রে চলেছে। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গেল। বীণা একটা পথ দেখতে পেল। যে পথ ধ'রে সে ছুটছিল, এ পথটা তার চেয়ে পরিষ্কার। গাছের উপর সে উঠতে পারত। কিন্তু যেমন-তেমন গাছে উঠলে রক্ষে পাওয়া ত যাবেই না—বরং বিপদ্ ঘটতে পারে। গোটা গাছটাই হয়ত দাঁত দিয়ে উপড়ে ফেলবে, না হয় শুঁড় জড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলবে। ছুটতে ছুটতে সামলাতে না পেরে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বীণা পড়ে গেল – আর বুঝি রক্ষে নেই—ভৈরব তাকে ধরে ফেল্‌ল ব'লে!

যে গাছে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেল, তারই কাছে আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল মহেশ্বর। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে —শুঁড় মাথার উপর উঁচু ক'রে তুলে। প্রকাণ্ড দেহের সমস্তটা দিয়ে সে শত্রুর গন্ধ পাচ্ছে। এ গন্ধ সে ভাল ক'রে চেনে—তার ছেলেবেলা থেকে মহাশত্রু ভৈরবের।

মহেশ্বরকে দেখতে পেয়ে বীণা তাকে অনেক ক'রে কাছে ডাকতে লাগ্‌ল। মহেশ্বর সে কথা কানেও নিল না। বীণার

মনে হ'ল সে তাকে দেখতে পায়নি। সাহস ক'রে বীণা মহেশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল—সে তবুও বীণার দিকে তাকাল না। শুঁড় আরও উঁচু ক'রে গর্‌গর্‌ ক'রে উঠল। গম্ভীর চাপা গর্জ্জনে পায়ের নীচের মাটি পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল।

মহেশ্বরের পায়ে বেড়ি-শিকল। এ অবস্থায় ভৈরবের সঙ্গে তার বোঝাপড়া করায় অসুবিধে হবার কথা। একে ভৈরব ক'দিন থেকে ক্ষেপে আছে, তাতে আবার ছাড়া পেয়েছে। বীণা আর কিছু ভাবতে পারল না—একমাত্র মহেশ্বরই এখন তার ভরসা। মহেশ্বরের কাছে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি তার পায়ের বেড়ি খুলে দিল।

ছাড়া পাওয়া মাত্রই মহেশ্বর ঝড়ের বেগে একেবারে ভৈরবের উপর গিয়ে পড়ল। তার প্রকাণ্ড শুঁড় দিয়ে ভৈরবের একটা দাঁত জড়িয়ে ধ'রে এক হ্যাঁচ্‌কা টান মারল - তার পরেই দুই হাতীতে ভীষণ লড়াই আরম্ভ হল। কতক্ষণ তাদের লড়াই চলেছে বীণা তার কিছুই জানে না—সে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে ছিল।

পাঁচ

জ্ঞান হ'লে বীণা কষ্টে উঠে বস্‌ল। আগের কথা ভাবতে চেষ্টা করল—সমস্ত ঠিক পরপর মনে এল না। তার এক কথার মধ্যে আর এক কথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। ভৈরবের কথা মনে হ'ল—তার পর মহেশ্বরের কথাও মনে পড়ল। জলঝড় থেমে গিয়েছে—সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার চোখে পড়ল খোলা মাঠের মাঝখানে মহেশ্বর দাঁড়িয়ে, আর তার প্রকাণ্ড ছায়ার আড়ালে ভৈরব ম'রে প'ড়ে আছে। আস্তে আস্তে মনে পড়ল, ভৈরব তাকে তাড়া করেছিল। মহেশ্বর ভৈরবকে মেরে ফেলেছে। এতক্ষণে মহেশ্বরের হুঙ্কার শোনা গেল – যেন তাল ঠুকে বল্‌ল, ভৈরবকে শেষ করেছি, এস, আর কে লড়বে!

বীণা উঠে বসেছে বুঝতে পেরে, মহেশ্বর তার দিকে এগিয়ে এল। তার শুঁড়ের আগাটা বীণার গায়-মাথায় একবার বুলিয়ে নিল। বীণা বার বার ভাবছিল কোন রকমে মহেশ্বরের পিঠে উঠতে পারলেই, বাংলোতে পৌঁছতে পারবে। এতক্ষণে তার বাবা-মা লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছেন।

বীণা সাহসে ভর ক'রে মহেশ্বরকে বসতে বলল—সে-কথায় সে আমলই দিলে না। মেজাজ তার তখনও বিগড়ে আছে।

কুলোর মত কান দুটো ঘনঘন নাড়ছে, আর মাঝে মাঝে শুঁড়টা মাথার উপর তুলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করছে।

বীণার আর কথা বলবার সাহস হ'ল না, সে চুপ ক'রে প'ড়ে রইল। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর ক্রমে মহেশ্বরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। এবার তার মুখ দিয়ে যে গুরুগম্ভীর আওয়াজ বেরুল তার অর্থ "বাস্, সব ঠিক হয়ে গেছে!"

বীণা এই রকম শব্দ খুব চেনে—সে নির্ভয়ে "বৈঠ্"—ব'লে তাকে বসতে হুকুম করল।

মহেশ্বর কিন্তু তবুও বস্‌ল না। কাছেই সে মানুষের গন্ধ পাচ্ছিল—মানুষ জাতটাকে সে মোটেই পছন্দ করে না। একটুখানির জন্যে স্বাধীন হয়েছিল, আবার এক্ষুনি বাঁধা পড়্‌বে। ঐ ত দূরে আলো আর কথাবার্ত্তার আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে—বোস্ সাহেব বীণার খোঁজে এদিকে আসছেন।

বীণা মহেশ্বরের মনের কথা বুঝতে পারল—মহেশ্বরের প্রকৃতি সে ভাল করেই জানে। মনে হ'ল মহেশ্বরকে ছেড়ে দিতে হবে—তা' হলে সে নিজের ইচ্ছেয় বনে বনে ঘুরে বেড়াতে পারবে। বোস্ সাহেবের লোকজন এসে পড়বার আগেই সে চলে যাক। বীণা হাত তুলে 'চলে যা' বলার ভঙ্গীতে বার বার বলতে লাগ্‌ল "ভাগো—জল্‌দি ভাগো—"

মহেশ্বর হুকুম তামিল করার অভ্যাস মত চলে গেল—কি

ভেবে আবার ফিরে এল—যাই—কি—না-যাই—ঠিক করতে পারছে না। এক দিকে একটা ছোট মেয়ে তার মন টানছে, আর এক দিকে টানছে তার স্বাধীনতার বিচরণ ক্ষেত্র রহস্যময় বিরাট্ আসামের জঙ্গল।

মাতৃভূমির টান যেমন মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ, মহেশ্বরের কাছেও তেমনি বনের টানই শেষ পর্য্যন্ত বড় হ'ল—কোথায় সে দেশ, তা সে কোন দিন দেখে নি, কেমন সে দেশ, তা-ও সে জানে না—তবুও সেই অজানা অরণ্য-দেশই তাকে ডাক্‌ছে। সে দৌড়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।—আর সে মানুষের চাকর নয়।

বীণার গলা শুন্‌তে পেয়ে বোস্ সাহেব লোকজন নিয়ে এগিয়ে এলেন।

বাংলোয় ফিরে, সে রাত্রে বীণার আর গল্প করবার শক্তি ছিল না। তা' হ'লেও মহেশ্বরকে সে ছেড়ে দিয়েছে—সে তাকে একেবারে বনে চ'লে যাবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে, একথা খুলেই বলেছিল।

বোস সাহেব শুনে বল্‌লেন—ঠিকই হয়েছে। মহেশ্বর কোন দিনই তেমন ক'রে পোষ মান্‌ত না—বুনো-বুনো স্বভাব ওর মজ্জাগত। আর তা ছাড়া, সে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে—সে কথা আমাদের ভুললে চলবে না।

নাথুরাম মংলাকে দিয়ে মহেশ্বরের দাঁত কেটে নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিল, এই ঘটনায় তা ভেস্তে গেল।

ছয়

স্বাধীন জীবনের আস্বাদ মহেশ্বরের কাছে একেবারে নতুন। সে পাগলের মত অন্ধকার বন ভেঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। সমস্ত রাত গেল, পর দিন রোদের তেজ না বাড়া পর্য্যন্ত সে এগিয়েই চলেছিল। বেলা বাড়লে গরমে কষ্ট হতে লাগল। জঙ্গলের মাঝখানে একটা জলা থেকে প্রাণ ভ'রে সে জল খেল—ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা হ'ল না দেখে শুঁড় ভর্ত্তি ক'রে জল নিয়ে সমস্ত গায়ে ছিটিয়ে দিল। সামনের পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে একজায়গায় খানিকটা কাদা করল, তারপর সেই কাদা তুলে গায়ে ভাল ক'রে ছড়িয়ে দিল। তাতে শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হ'ল। জঙ্গুলে মশা-মাছির হাত থেকেও রেহাই পেল। কারখানার কাছে মশা-মাছির এত উৎপাত ছিল না।

এবার সে দিব্বি আরামে চ'রে খেতে লাগ্‌ল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আবার চলা সুরু করল।

সন্ধ্যের দিকে তার চোখে পড়ল একদল হাতী, অর্থাৎ তারই স্বজাত চ'রে বেড়াচ্ছে। আগেও একদিন এই রকম হাতীর দলকে চ'রতে দেখেছিল, তখন তার পায়ে শিকল-পরানো ছিল। আজ যে স্বাধীন। দলের কতকগুলো পুরুষ হাতী মহেশ্বরকে

দেখে, মাথা নেড়ে আর কান ঝাড়া দিয়ে কয়েকটা হুঙ্কার দিল। মহেশ্বরের রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে উঠল। ইচ্ছে হ'ল এখনই এই অর্ব্বাচীন ক'টাকে একহাত দেখিয়ে দেয়। কিন্তু তখনও তার অজানা জঙ্গলরাজ্য তদারক করবার ঝোঁকই প্রবল।

চলেছে ত চলেছেই। নদী পার হ'ল, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াল। কাঁটা বনের মাঝ দিয়ে গায়ের জোরে পথ ক'রে চল্‌ল। যেমন ইচ্ছে গেল, বিশ্রাম করল, খেয়াল হ'ল শুঁড় জড়িয়ে মোটা মোটা গাছের ডাল মট্‌মট্‌ ক'রে ভাঙ্গল। এমনি করে পুরো একটা মাস গেলে, তার হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতার উদ্দাম বেগ কিছু মন্দা হয়ে এল।

এ-পর্য্যন্ত সে বরাবর উত্তর মুখো চলছিল, এবার ফিরল। দিন কয়েক পরে, পথে আর একদল হাতীর সঙ্গে দেখা। এখন তার মন চাচ্ছে এই জাত-ভাইদের সঙ্গে মিশতে—তারও একটা দল থাক্‌বে সে দলের সেই হবে সর্দ্দার। সেবারের মত, মহেশ্বর হাতীর দলকে এড়িয়ে না গিয়ে দলের মাঝ ঘেঁসে এগিয়ে এল—বেশ গদাই-লস্করি চালে। তার উঁচু লম্বা বিশাল চেহারা দেখে মেয়ে হাতীগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে বাচ্ছাদের সঙ্গে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ছুট দিল। হঠাৎ এই রকম একটা ব্যাপার ঘটাতে ছোকরা হাতীগুলো খাওয়া ছেড়ে কান খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে গেল—দেখে, দলে কোথাকার একটা দাঁতাল ঢুকেছে। গতিক ভাল নয় বুঝলেও সহসা দাঙ্গা বাধাতে তাদের সাহস হ'ল না—যে প্রকাণ্ড দাঁত আর দশাসই চেহারা! ভাব্‌ল

অপেক্ষা করা যাক্ - দলপতি আসুক, তারপর যা হয় হবে। কাজেই তারা রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌তে থাকলেও মহেশ্বরকে আক্রমণ করল না।

দলের সর্দ্দার-হাতী নিকটেই ছিল, একটু পরেই হুঙ্কার দিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে এল। সে-ও আর এক প্রকাণ্ড দাঁতাল—দেখলেই মনে হয় সর্দ্দার হবার উপযুক্ত বটে! দেখতে দেখতে দুই হাতীতে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল।

দলপতিকে কাবু করা মহেশ্বরের পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। ভৈরবকে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেরেছে বটে, কিন্তু সে মানুষের আওতায় বড় হয়েছিল। এই বন্য দলপতির তুলনায় তার গায়ের জোর, দাঁতের জোর অনেক কম ছিল। তা'ছাড়া এ দল নিয়ে বনে বনে চ'রে বেড়ায়, মাঝে মাঝে দুটো একটা দাঁতাল হাতীর সঙ্গে লড়াই করা তার অভ্যাসও আছে।

দুই হাতীর চীৎকার, আর গুঁতোগুঁতি। এক একবার মহেশ্বর দলপতিকে দাঁতের ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে, আবার দলপতির ধাক্কা সামলাতে না পেরে মহেশ্বর ছিটকে পড়ছে। তাদের ধাক্কাধাক্কির চোটে আসে-পাশের গাছগুলো পাঁকাটির মত মট্‌মট্ ক'রে ভেঙ্গে পড়্‌ল—বাঁশ-ঝাড় উপড়ে গেল, পায়ের তলায় মাটি কুস্তির আখড়ার মাটির মত ঝুর্‌ঝুরে ধূলো-ধূলো হয়ে গেল—যুদ্ধের তবু শেষ নেই। মাঝে মাঝে একটু সময়ের জন্যে দম নিয়ে আবার তুমুল কাণ্ড। এ যুদ্ধে আপোস-মীমাংসার স্থান নেই—একটাকে হারতে হবেই। তাকে হয় রণে

ভঙ্গ দিয়ে সুযোগ মত পালাতে হবে, না হয় প্রাণ দিতে হবে।

যুদ্ধ শেষ হ'ল কিন্তু খুব হঠাৎ—অনেকক্ষণ লড়াইয়ের পর দলপতি আর টিঁকতে না পেরে পালিয়ে গেল। এমন দৌড় দিল যে, মহেশ্বরের দিকে ফিরে তাকাতেও আর তার সাহসে কুললো না—দেখতে দেখতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মহেশ্বরের দাঁতের গুঁতোয় তার সমস্ত শরীর বেয়ে দরদর্ ক'রে রক্ত পড়ছে। মহেশ্বরের উঠতি বয়স্, আর সে বুড়ো হ'তে চলেছে। দলপতির জীবনে এতবড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তাকে কখনও লড়াই করতে হয় নি।

দলপতিকে সম্মুখ-সমরে হারিয়ে দিয়ে মহেশ্বর এখন থেকে এই হাতীর দলের দলপতি হ'ল। সে শুঁড় মাথার দিকে উঁচু ক'রে দলের মাঝে এসে দাঁড়ালো। পরপর বার কয়েক হুঙ্কার দিল। তাল ঠুকে যেন জোর গলায় বলতে চায়—"এস, আর কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও—এস!" বলা বাহুল্য দলের আর যে সমস্ত পুরুষ হাতী ছিল, তারা কেউ-ই এদিকে এগোলো না।

সাত

মহেশ্বর তার দল সঙ্গে নিয়ে মাসের পর মাস বনে বনে চ'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে এখন স্বাধীন, - শুধু স্বাধীন নয়, সে একটা দলের সর্দ্দার। এত দিন ধ'রে যা সে চেয়েছিল তা আজ পেয়েছে।

জঙ্গলের এক জায়গায় ছিল একটি পাহাড়ের নদী, আর অফুরন্ত বাঁশ-বন। দল নিয়ে সেখানে সে কিছুদিন আড্ডা গাড়্‌ল। সকালে বিকালে নদীতে মহাফুর্ত্তিতে স্নান করে, আর পেট ভ'রে বাঁশের কোঁড় খায়—বাঁশের কোঁড় জিনিসটা হাতীর খুবই প্রিয় খাদ্য। দুপুরের গরমে গাছের ছায়ায় যে-যার ইচ্ছে মত বিশ্রাম করে। এই ভাবে বর্ষাকাল কাটিয়ে আবার সে দল নিয়ে চলতে লাগ্‌ল।

সে দল নিয়ে চলেছে,—বনে বনে মনের আনন্দে, স্বাধীন বে-পরোয়া ভাবে। মানুষের তা সহ্য হ'ল না। পাকা একজন হাতী-শিকারী লাগ্‌ল এদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। তিনি ক্রমে খবর পেলেন, দলে আটটা পুরুষ হাতী, ষোলটা মেয়ে হাতী আর গোটা চারেক বাচ্চা হাতী আছে।

অমনি সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল। অনেক লোকজন লাগিয়ে তাড়াতাড়ি এক জায়গায় 'খেদা' তৈরী হ'ল। তার-

পরের কাজ হাতীর দলকে তাড়া দিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে খেদার দিকে নিয়ে যাওয়া।

'খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া,' অর্থাৎ 'তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া' থেকে, এই রকমে হাতী ধরার নাম, 'খেদা' ক'রে হাতী-ধরা হয়েছে।

মহেশ্বর চলতে চলতে হঠাৎ একদিন মানুষের হৈ হৈ শুনতে পেল। তারা অনেকে মিলে ঢাক, ঢোল, কাঁসি, জগঝম্প, কাড়া-নাগাড়া বাজিয়ে, মশাল জ্বেলে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে। উদ্দেশ্য হাতীর দলকে ভড়্‌কে দিয়ে যেখানে তারা খেদা তৈরী ক'রে রেখেছে, সেইদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। শিকারীটি খুব পাকা লোক, অনেক দিন থেকে, অতি সাবধানে এই দলের পিছন নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এ দলের যে দলপতি, তার মানুষের দেওয়া একটা নাম আছে—আর মানুষ-জীবটাকে সে বেশ জানে ও চেনে।

নিস্তব্ধ বনে অকস্মাৎ এমন সোর-গোল হওয়ায় মহেশ্বরের সন্দেহ হ'ল। সে আর এগিয়ে না গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো—দলপতি সাধারণতঃ দলের পিছন দিকে থাকে। একটুখানি ভেবে নিল, ব্যাপারটা কি হ'তে পারে। মানুষের গন্ধ সে অনেক দিন পায় নি। বেশ ছিল। আবার এ উৎপাত কেন? সে ত মানুষের কাছে যায় না, তাদের কোন ক্ষতিও করে না। তবুও তারা তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না! বড় রাগ হ'ল তার। কুলী আর বন-তাড়ুয়ারা লাইন দিয়ে যে দিকে হৈ হৈ করছিল, সেই দিকে তেড়ে গেল। অতবড় পাহাড়ের মত দাঁতাল এক ঐরাবতকে

রুখে আসতে দেখে লোকজন লাইন ভেঙ্গে যে যে-দিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। মহেশ্বর হুঙ্কার দিতে দিতে অন্য দিক্ দিয়ে দল-বল নিয়ে বনের মধ্যে গা-ঢাকা দিল।

আবার তার বনে বনে চলা আরম্ভ হ'ল। এখন থেকে সে সাবধানে পথ চলে। এত বড় একটা দলের ভাল-মন্দ যার উপর নির্ভর করে তার অসাবধান হ'লে চলবে না—তার উপর মানুষ তার পিছু নিয়েছে। একসময় সে মানুষের কাছে শিকলে বাঁধা ছিল। ছাড়া পেয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে যেখানে মানুষের যাতায়াত নেই। ভেবে ছিল, আর কোন দিন সে মানুষের ত্রিসীমানায় যাবে না—কিন্তু মানুষ তাকে কিছুতেই ছাড়ছে না।

চলতে চলতে কখনও কখনও অসভ্য মিরি, মিস্‌মি, নাগাদের গ্রামের পাশ দিয়ে সে গিয়েছে। এদের উপর তার কোন রাগ হয় নি। কারখানার কাজ করবার সময় যে ধরণের মানুষ সে দেখেছে এরা মোটেই সে রকমের নয়—খামখা কেন সে এদের ক্ষতি করতে যাবে।

একবার সে নাগাদের একটা গ্রামের কাছে দল নিয়ে দিন-কয়েক আড্ডা করেছিল। গ্রামের লোকেরা প্রথমে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। তাদের ছোট ছোট কুঁড়েগুলো ইচ্ছে করলেই সে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারত। মহেশ্বরের দল তাদের কোন ক্ষতি করল না দেখে, একদিন তারা কত ভাল ভাল বুনোফল, কলাগাছ, কুলো ভ'রে ভ'রে ধান এনে খেতে দিল। এরা বেশ মানুষ

আট

এরপর আট-দশ বছর কেটে গেছে। বোস্ সাহেবের কাঠের কারখানার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। বোস্ সাহেব এখন কলকাতায় থাকেন। আসামের কারখানার কাজ-কর্ম্ম দেখেন মল্লিক সাহেব—তাঁর জামাই। বীণা বড় হয়েছে। সে এতদিন কলকাতায় পড়াশুনো করছিল। বিয়ের পরে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে আবার তার ছেলেবেলাকার জায়গায় ফিরে এসেছে। আসামের জঙ্গল, কারখানার বাংলো তার কাছে একটুও নতুন নয়।

একদিন, লোকজনের মুখে খবর পাওয়া গেল বাংলো থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড বুনো দাঁতাল হাতী দেখা গেছে। সেটা দেখতে একটা ছোট-খাটো পাহাড়ের মত। এতবড় হাতী এ অঞ্চলে কেউ কখনও দেখে নি। মল্লিক সাহেবও কথাটা শুনেছিলেন—কিন্তু গুজোব কথায় তেমন কান দেন নি।

মাস দুই পরে একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘট্‌ল। বাংলোয় রাত্রের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। শুতে যাবার আগে বাংলোর বারান্দায় ব'সে মল্লিক সাহেব চিঠি লিখছেন—পরদিন ডাকে পাঠাতে হবে। ডাকঘর এখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে।

সকালে একজন লোক কারখানার চিঠি পত্র নিয়ে ডাক-ঘরে যায় এবং বিকালের দিকে ডাকের চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে আসে।

চিঠি লেখা প্রায় হ'য়ে এসেছে—রাত তখন বারটার কাছাকাছি। এমন সময় দূর থেকে লোকজনের হৈ-হৈ হল্লা শোনা গেল। গোলমাল ক্রমেই নিকটে আসতে লাগল। ব্যাপার কি জানবার জন্যে মল্লিক সাহের বাংলোর বারান্দা থেকে সামনের উঠোন পার হয়ে এগিয়ে দেখতে গেলেন।

দেখতে দেখতে লোকজন কুলীমজুর একসঙ্গে হট্টগোল ক'রে কারখানার প্রকাণ্ড উঠোনে জমায়েত হ'ল। একটা বুনো হাতী তাদের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে তাড়া করেছে। আগুনকে হাতী সবচেয়ে বেশী ভয় করে। চারিদিকে কত মশাল জ্বালা হয়েছে। কিন্তু এ গুণ্ডা হাতী কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করছে না—ভেঙ্গে-চুরে তছ্-নছ্ ক'রেই চলেছে।

মল্লিক সাহেব বন্দুক নিয়ে এলেন। কি হবে এ অবস্থায় বন্দুক দিয়ে? একটা দুটো গুলিতে কিছুই হবে না, বরং হাতীটা আরও ক্ষেপে যাবে। তা'ছাড়া হাতীর কোন্ জায়গায় গুলি করলে নিশ্চয়ই মরবে, মল্লিক সাহেব তা ভাল জানেন না।

হিংস্র জন্তুর মাথার ঠিক কোন্ জায়গা লক্ষ্য ক'রে গুলি করলে সে গুলি তার মগজে গিয়ে বিঁধবে, পাকা শিকারীদের তা জানা দরকার। গুলি যেখানে-সেখানে লাগায় শিকার মরল না, এরকম হ'লে আহত জানোয়ার ক্ষেপে গিয়ে শিকারীকে

এমন ভীষণ আক্রমণ করে যে, তখন শিকারীর প্রাণ-বাঁচান কঠিন হয়।

মল্লিক সাহেব বন্দুক নিয়ে গুলি করবেন কি করবেন না ভাবছেন দেখে, বীণা এগিয়ে এসে বল্‌ল—এ হাতী নিশ্চয়ই আমাদের মহেশ্বর। আমাকে বাইরে যেতে দাও—ওকে আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

এরকম অদ্ভুত কথা কেউ কখনও শোনেনি—বীণা যাবে গুণ্ডা হাতীকে ঠাণ্ডা করতে! মল্লিক সাহেব উত্তেজনার মুখে বললেন—পাগল হয়েছ নাকি?

তারপর বীণাকে বললেন—তুমি খুকীকে নিয়ে আয়ার সঙ্গে আস্তাবলের ভিতর সাবধানে থাকোগে। খুকী, এদের তিন বছরের মেয়ে। আস্তাবলই সবচেয়ে নিরাপদ্, কেননা হাতী কখনই ঘোড়ার কাছে এগুতে চায় না। এদের মধ্যে এই এক অদ্ভুত সম্পর্ক।

ততক্ষণে পাগলা হাতী বাংলোর বাইরে ফটকের কাছে এসে প'ড়েছে। কারখানার বাংলোর খুঁটি খুব মোটা মোটা শেগুনের। তারই একটা মোটা খুঁটি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে এক টান দিতেই বাংলোর সে-দিকটা মড়্-মড়্ শব্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল। হাতী কয়েক পা হ'টে গেল—সে জানে যেখানে দাঁড়িয়ে টান মেরেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বাংলো ভেঙ্গে তারই উপর পড়বে।

মল্লিক সাহেব এখনও কিন্তু গুলি করতে সাহস করছেন না। এক গুলিতে যদি শেষ না হয়, ক্ষেপা হাতী যখম হ'লে কি আর রক্ষে থাকবে! তার চেয়ে দেখা যাক, ঘর-বাড়ী

ভাঙ্গবার ঝোঁক কেটে গেলে হয়ত আপনা থেকেই চ'লে যাবে।

বাংলোর যে-দিক্‌টা ভেঙ্গে পড়্‌ল, সে-দিক্‌টায় ছিল আফিস কামরা। আফিসের চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজপত্র সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল—আর হাতীটা সেই সমস্ত পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করল।

পনেরো-কুড়ি মিনিট ধ'রে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে, তার খেয়াল হ'ল—ঢের হয়েছে, আর না। এবার সে স্বাভাবিক গজেন্দ্র-গমনে হেলে দুলে বনের দিকে চ'লে গেল। যেতে যেতে দেখলে কয়েকটা পোষা হাতী বাঁধা রয়েছে—এদের কেউ কেউ তার আগের চেনা। মানুষের কৃতদাস এই সমস্ত জীবের দিকে ঘৃণায় সে ভাল ক'রে তাকালও না।

নয়

বীণার অনুমান ঠিকই—এই হাতীটি আমাদের মহেশ্বরই বটে। এরকম ক'রে ক্ষেপে যাবার কারণ তার ছিল।

দলবল নিয়ে বনে বনে বেশ চ'রে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় শিকারীরা তাদের দলসুদ্ধ খেদায় আটক করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি—সে খবরও একটু আগেই দিয়েছি। মহেশ্বর নিশ্চিন্ত ছিল এই ভেবে, যে মানুষে তার আর কিছু করতে পারবে না। তাদের ফন্দি-ফিকির তার ভাল ক'রেই জানা আছে।

সে বারে মহেশ্বর খেদায় আটক পড়ল না বটে; কিন্তু হাতী-শিকারীরা খুব হুঁসিয়ার লোক, এদের কাছ থেকে অত সহজে রেহাই পাওয়া গেল না। গোপনে গোপনে খুব সাবধানে লোক লেগে থাকল জঙ্গলের ভিতর কোন্ দিক্ দিয়ে হাতীর দলটা কোথায় যায় লক্ষ্য করার জন্যে।

এদিকে বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। চারিদিকে হাজারে হাজারে চারাগাছ গজালো। গরমের সময় রোদের তেজে যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের পাতা ঝ'রে নেড়া হয়ে গিয়েছিল সেগুলোতে আবার কচিকচি নতুন পাতা দেখা দিল। সমস্ত বনেরই চেহারা ফিরে গেল—মহেশ্বর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আনন্দে পেট ভ'রে খেয়ে বেড়াতে লাগল।

শিকারীর সন্ধানী লোক, যারা মহেশ্বরদের পিছু নিয়েছিল, তাদের কাছে, এ সময় খবর পাওয়া গেল, দাঁতাল সর্দ্দারটাকে দলের ভিতর দেখা যাচ্ছে না। বুনো দাঁতাল হাতীদের একটা স্বভাব এই, তারা দল ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যায়। শিকারীরা বলে, পাহাড় পর্ব্বত পার হ'য়ে ওরা তখন উত্তর দিকে যায়। মাস দুই পরে দলে ফেরে, আবার আগের মত দলের খবরদারি করে। ঠিক কোথায় যায় কেউ বলতে পারে না—এটা যেন হাতীদের একটা গুপ্তকথা।

মহেশ্বর দল রেখে চলে গেল—আবার ফিরেও এল। কিন্তু এই মাস দুয়েকের মধ্যে একটা মস্ত দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তার দলের সমস্ত হাতীগুলোই মানুষে খেদা বন্দী ক'রে লুটে নিয়েছে। মহেশ্বর পুরোনো জায়গায় ফিরে, চারিদিকে ঘুরে দেখল, খেদার সাজ-সরঞ্জাম তখনও এদিকে-ওদিকে কিছু কিছু পড়ে রয়েছে। অন্য হাতী এ অবস্থায় দিন কয়েক মন-মরা হ'য়ে একা-একা ঘুরে বেড়ায়, তারপর সুবিধে বুঝে অন্য একটা দলে ভীড়ে যায়।

খেদা যেখানে হয়েছিল মহেশ্বর সেখানটা বার বার ঘুরে ঘুরে দেখ্‌ল। দুটো বুড়ী-হাতী আর একটা খোঁড়া দাঁতাল তখনও এক জায়গায় বাঁধা ছিল। আর এক দিকে একটা সরু পথ দেখতে পেল, অনেকগুলো হাতী এক সঙ্গে চ'লে গিয়েছে তাতেই পথ হ'য়ে প'ড়েছে। এই পথ ধ'রে সে এগিয়ে গেল,—আরও এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে এসে পড়্‌ল। মাথাটা তার তখনও

ভয়ানক গরম—ভিতরে ভিতরে জ্বলে যাচ্ছে—সে নদীতে নেমে আচ্ছা ক'রে স্নান করল।

যে পথ ধ'রে সে এল, সে পথ নদীর ধার দিয়ে গিয়েছে। আরও এগিয়ে গেলে দেখল, তারই দলের হাতীগুলো শিকল দিয়ে একটা একটা ক'রে মোটা মোটা গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। অন্যদিকে ডাকাত মানুষ গুলো তাঁবুর ভিতরে খুব আমোদ-আহ্লাদে মেতে আছে।

মানুষের উপরের রাগ মনের আনন্দে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোয় চাপা প'ড়ে গিয়েছিল, সেই পুরোনো রাগ আবার মাথা-চাড়া দিলে। কুলী মজুরগুলো ত নগণ্য। খাকী-প্যাণ্ট-পরা হ্যাট্-মাথায় লোকগুলোই হচ্ছে নষ্টের গোড়া। মহেশ্বর এদিক্-ওদিক্ তাকাল, তারপর রাগে গর্-গর্ করতে করতে প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে নিকটে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগ্‌ল।

একটু পরে একজন প্যাণ্ট-পরা হ্যাট্-মাথায় ডাকাত-লোক ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁবুর কাছে এসে চট্‌পট্ কি-সমস্ত হুকুম দিয়ে, হাতীগুলোকে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে, যেমন ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল তেমনি তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। মহেশ্বর ঘোড়ায়-চড়া লোকটাকে কেন যে কিছু বল্‌ল না তা সেই জানে।

মনে পড়্‌ল তার সেই অনেক দিনের বন্দী দিনের কথা। বোস্ সাহেবের বাংলোর কথা। সেখানেও একজন প্যাণ্ট-পরা হ্যাট্-মাথায় মানুষ থাকে, সেই ত তাকে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে ছিল। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল দপ্ ক'রে—তখনই সে

বোস্‌ সাহেবের কারখানা এবং তাঁর বাংলোর দিকে ছুট্‌ল—সে জায়গাটা আসামের জঙ্গলের কোন্‌ দিকে মহেশ্বর এত দিনেও তা ভোলে নি। তবে সে জানে না যে, সেখানে তার সেই পুরোনো মালিক বোস্‌ সাহেব আর থাকেন না।

মহেশ্বর সেখানে গিয়ে যে সব কাণ্ড ক'রেছে তা আগেই ব'লেছি।

দশ

ঝড়ের পর চারিদিক্ শান্ত হয়। রাগের ঝোঁকে সুন্দর সাজানো-গোছানো বাংলোর খানিকটা ভেঙ্গে চুরে তছ-নছ ক'রে মহেশ্বরের রাগ প'ড়ে এল—অন্ধকার জঙ্গলে গিয়ে সে হাঁপাতে লাগ্‌ল।

কি বিপুল তার দেহ! সাতাশ বছর বয়েসেই সে সাধারণ বুনো হাতীর চেয়ে অনেক বেড়ে উঠেছিল—তারপর থেকে প্রতি বৎসরেই বেড়েছে। মানুষের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে যে কেবল খেয়ে দেয়ে ওজনে বেড়েছে তা নয়—শক্তিও তার অসম্ভব রকম বেড়েছে। বত্রিশ বছর বয়সে সে দেখতে একটা ছোটখাট পাহাড়, শক্তিতে দশটা হাতীর সমান। পুরো সাত হাত উঁচু—মাটি থেকে গর্দ্দান পর্য্যন্ত। ওজনে দেড়শ মণ, সামনের পায়ের বেড় তিন হাতেরও বেশী। প্রকাণ্ড দুই দাঁতের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এ রকম একজোড়া সুন্দর আর মস্ত দাঁত আসামের জঙ্গলে কেন, সারা ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মের জঙ্গলেও দেখতে পাওয়া যায় না।

এরপর এল তার মন-মরা ভাব। একটা বছর গেল সেই মন-মরা ভাব কাটতে। পরের বছর সে খানিকটা সুস্থ হ'ল। এই বছর সে নিজের মনে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ফিরে খেয়ে

বেড়াল। সেই বছরের শেষের দিকে আমাদের চেনা সেই নাথুরাম আর এক কাণ্ড ক'রে ছিল।

মহেশ্বর এক সময়ে বোস্ সাহেবদের কারখানার হাতী ছিল। সে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশকে এ খবর জানান হয়েছে। মহেশ্বরকে যে কেউ আবার ধরুক না কেন—সে আইন অনুসারে বোস্ সাহেবদের সম্পত্তি। তবে, কেউ তাকে ধ'রে কাঠের কোম্পানীর হাতে ফিরিয়ে দিলে কোম্পানী তাকে বখশিস করতে পারে। নাথুরাম, মহেশ্বরের খবর পেয়ে, ঠিক করল সে তাকে গোপনে ধ'রে একেবারে মণিপুরের সীমানায় নিয়ে বিক্রী ক'রে দেবে—যেমন ক'রে চোরেরা তাদের চোরাই মাল বিক্রী করে। এই হাতীই যে এক সময় কাঠের কোম্পানীর হাতী ছিল, আর তার নাম ছিল মহেশ্বর,—সে কথা প্রকাশ পাবে না। কিন্তু হাতীর গায়ে কোম্পানীর নামের মার্কা দেওয়া আছে। এত দিনে সে মার্কা খানিকটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তারই উপর নাথুরাম নিজের নামের মার্কা মোটা মোটা কায়েথী অক্ষর দিয়ে, আগেকার মার্কা ঢেকে দেবে।

অনেক দিন আগে নাথুরামের কাছে মংলার একবার ডাক প'ড়েছিল, মহেশ্বরের দাঁত কেটে নেবার যুক্তি আঁটতে। আজ আবার তার তলব হ'ল মহেশ্বরকে ধরে গোপনে গোপনে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে। মংলা ছিল মহেশ্বরের মাহুত—সে ছাড়া আর কেউ তাকে সহজে কায়দা ক'রতে পারবে না।

বুনো হাতী ধরার অনেক রকম কায়দা আছে। খেদা তৈরী ক'রে, হাতীর দল তার মধ্যে তাড়িয়ে আটক করাই হ'ল সাধারণ ব্যবস্থা। তা' ছাড়া গর্ত্ত কেটেও হাতী ধরা হয়। তা'তে একটা হাতী ধরা পড়ে। শিকারীর লোকেরা জঙ্গলে গভীর একটা গর্ত্ত কেটে তার উপরটা ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেয়। তার পর হাতীকে তাড়িয়ে এনে সেই গর্ত্তে ফেলে।

সন্ধানী লোকেরা নাথুরামকে এসে খবর দিল, পাহাড়ের ধারে পাহাড়ীদের গ্রামের কাছে মহেশ্বরকে দেখা গিয়েছে। তার মেজাজ, যতদূর লক্ষ্য করা গিয়েছে, বেশ ভালই। খবর পেয়ে নাথুরাম লোকজন নিয়ে রওনা হ'ল—মংলাও অবশ্য সঙ্গে চল্‌ল। পাহাড়ীদের গ্রামে পৌঁছে, ভাল রকম বক্‌শিস ক'রে নাথুরাম গ্রামের সর্দ্দারকে আগে হাত করল। তারই সাহায্যে মহেশ্বরের চলা-ফেরার পথে দশ হাত গভীর একটা গর্ত্ত কাটালো। সর্দ্দারের সঙ্গে কথা থাকল তাদের এই হাতী ধরার কথা একেবারে গোপন রাখতে হবে। আসামের জঙ্গল এত প্রকাণ্ড যে, কোথায় তার কি হচ্ছে তা' আপনা-আপনি প্রকাশ হবার সম্ভাবনা কম।

জায়গা বেছে গর্ত্ত কাটা হ'ল। গর্ত্তের মুখে এক দফা বাঁশ ফেলে, তার উপরে গাছপালা দেওয়া হ'ল। বুঝবার জো থাকল না যে, নীচেয় গর্ত্ত আছে। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক হ'লে, চারজন জংলী মহেশ্বরের দিকে এগিয়ে

গেল। উদ্দেশ্য, মহেশ্বরকে রাগিয়ে দেওয়া। এ জন্যে বেশী চেষ্টা করতে হ'ল না। বিশেষতঃ, মহেশ্বর যখন বুঝতে পারল, এরা তার সঙ্গে খোঁচাখুঁচি করতে এসেছে, তখন সে অল্পতেই রুখে এল। এরা এঁকে বেঁকে, এ-গাছে ঘুরে ও-গাছে ঘুরে পালাতে লাগল। মহেশ্বর তাদের ধ'রতে না পেরে আরও ক্ষেপে গেল,—সে-ও গাছপালা ভেঙ্গে তাড়া করল। জংলী ক'জনই আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছে, তেমন তেমন বেগতিক দেখলে, কোন্ কোন্ গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাতে পারবে।

মহেশ্বরের অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, তাই সে রাগের চোটে বিবেচনা-শূন্য হয়ে তাড়া করছিল। তা' না হ'লে হাতী সাধারণতঃ পথ চলবার সময় ভাল ক'রে পথের অবস্থা দেখে-শুনে খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে চলে। জানা পথে নিঃসন্দেহে যায়। অজানা পথে, পদে পদে পথের অবস্থা পরীক্ষা ক'রে তবে এগোয়।

যে রকম মতলব আঁটা হয়েছিল, তাই-ই হ'ল। মহেশ্বর লোক কয়জনকে তাড়া করতে করতে শেষকালে সেই গর্ত্তের মধ্যে হুড়্মুড়্ ক'রে প'ড়ে গেল। আর যায় কোথায়! নাথুরামের লোকজনেরা জড়ো হয়ে যে যেমন পারল তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করল। কেউ তাকে পাথর ছুড়ে মারল, কেউ ছুঁচলো বাঁশ দিয়ে খোঁচাল, কেউ তার গায়ে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে ছেঁকা দিল। মহেশ্বরের সমস্ত শরীর

কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল—তবুও তাদের অত্যাচার চলতে লাগ্‌ল। মহেশ্বরের অপরাধ সে যন্ত্রণায় এবং রাগে তখনও চীৎকার করছিল। গর্ত্ত গভীর, কিন্তু লম্বা-চওড়ায় কম, তার মধ্যে মহেশ্বরের নড়াচড়া করবার জো ছিল না। সে শুঁড় দিয়ে গর্ত্ত বড় করবার চেষ্টা করল—কিন্তু সব বৃথা হল।

এই অবস্থায় তিন দিন গর্ত্তের মধ্যে থাকবার পর দেখা গেল, মহেশ্বরের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে প'ড়েছে—প্রকাণ্ড শরীরটা শুধু কঙ্কালের উপর চামড়া দিয়ে ঢাকা—সে ধুক্‌ছে।

নাথুরাম বুঝল, এখন তাকে সহজেই কায়দার মধ্যে আনা যাবে। সে গর্ত্তের মাঝে কিছু খাবার জিনিস আর জল নামিয়ে দিল। মহেশ্বরের ছেলেবেলায় একবার ঠিক এই রকম হয়েছিল। তখন যে রাগে দুঃখে প্রথম প্রথম কিছুই খায়নি। এবার সে অনেক সেয়ানা। জানছে, খেয়ে দেয়ে আগে জোর না করলে এর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। সে বেশ নির্ব্বিবাদে জল খেয়ে, তারপর খাবার খেয়ে নিল। নাথুরাম ভাব্‌ল লক্ষণ ভাল। মহেশ্বরও মানুষ জাতটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে,—সময় আসুক তখন সুদে আসলে এর শোধ সে তুলবে।

মহেশ্বর খেতে আরম্ভ করেছে, আর বেশ শান্ত শিষ্ট হয়ে আছে দেখে, লোকজনেরা গর্ত্তের এক দিকের মাটি

ঢালু ক'রে কেটে তাকে উপরে তুলল। আবার সে মানুষের শিকল পায়ে পরল। মংলা তাকে বসতে বললে বসল, উঠতে বললে উঠল—কষ্টে সৃষ্টে তাকে কাঁধে চাপিয়ে হাত কয়েক ঘুরে ফিরে এল।

ধরা পড়ার পর এক দিন, দুই দিন ক'রে দশ মাস হয়ে গেল, মহেশ্বর একটু একটু ক'রে গায়ে জোর পাচ্ছে। মংলা তাকে অকারণে যখন তখন ডাঙ্গশ মেরে বাহাদুরি দেখায়, মহেশ্বর সহ্য করে—যেন কতই সে নিরীহ গো-বেচারী বাধ্য হাতী। আরও কিছু দিন তাকে এ সমস্ত সহ্য করতে হবে—তারপর সে দেখে নেবে। প্রথমেই শেষ করবে ঐ মাহুত মংলাকে—তারপর সমস্ত মানুষ-জন্তু-গুলোকে শুঁড়দিয়ে টেনে এনে পায়ের তলায় পিষে মারবে।

এগার

লোকে যখন মনে করে সব ঠিক চলছে, দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই, অনেক সময় ঠিক সেই সময়েই সকলের চোখ এড়িয়ে আস্তে আস্তে বিপদের কালো মেঘ জমা হতে থাকে। বোস্ সাহেবের চাকরিতে থাকবার সময় মংলাই মহেশ্বরের মাহুত ছিল। তখন সে তাকে চালাত, এখন আবার সেই তার মাহুত হয়েছে। নাথুরামের কাছে মাইনে বেশী পাচ্ছে, তাতেই সে খোশমেজাজে আছে। আগের মহেশ্বর আর এখনকার মহেশ্বরে যে কতখানি তফাৎ তা সে বুঝতে চেষ্টা করে নি। প্রকৃতির অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ—মহেশ্বরেরও অত্যন্ত বাধ্য হয়ে চলা তার খুনে-মূর্ত্তি ধরার পূর্ব্বাভাস।

মহেশ্বর সুস্থ হয়ে উঠছে, এবং মংলার খুব বাধ্য হয়ে চলছে। এই সময় নাথুরাম একটা খেদা করল। লোক-জনেরা দুই মাস ধ'রে আস্তে আস্তে একদল হাতীকে খেদার দিকে তাড়িয়ে আনল। দুই ধারে পাহাড়, তার মাঝখান দিয়ে ছোট নদী, জল শুকিয়ে বালি-সার হয়ে আছে। সরু পথে হাতীর দল তাড়া খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। খানিক দূরে গিয়ে নদীর খাদ বেঁকে গিয়েছে। বাঁকের

মাথায় আর এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ ক'রে দলটাকে একটা সমান জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে গেল, সেই খানেই তিন দিক্ ঘিরে হাতী আটকানর খেদা তৈরী ছিল। ঘেরা জায়গায় হাতীর দল ঢুকলেই ইঁদুর-কলের দরজার মত, ঝুলনো দরজা পড়ে গেল—হাতীর দল তার মাঝে আট্‌কা পড়ল। খেদার বেড়া এবং তার দরজার ভিতর দিকে মস্ত মস্ত পেরেক পোঁতা। খেদা ভেঙ্গে বেরুতে চেষ্টা করলে সেই পেরেকের খোঁচা লাগে। জ্বলন্ত মশালের ছেঁকা, ছুঁচলো বাঁশের খোঁচা—এ সমস্তও আছে।

দিন কয়েক এই বন্দী হাতীদের না খেতে দিয়ে দুর্ব্বল ক'রে, শেষে পোষা হাতী দিয়ে এক একটা ক'রে তাদের পায়ে শিকল পরানো হয়। হাতী ধরা এবং ক্রমে তাদের সায়েস্তা ক'রে, অর্থাৎ শিক্ষা দিয়ে মানুষের কাজে লাগানোর এই হ'ল পদ্ধতি। অবশ্য ব্যাপারটা যত সংক্ষেপে বলা হ'ল কাজের বেলায় তত সংক্ষেপে হয় না। এ কাজে টাকা খরচ করতে হয় যথেষ্ট, লোকজনও দরকার হয় অনেক, এবং তাদের জীবনের আশঙ্কাও থাকে পদে পদে।

নাথুরাম যে হাতীর দলটিকে খেদায় ধরলে, তাদের সায়েস্তা করবার জন্যে কয়েকটা পোষা হাতী এল—তার মধ্যে মহেশ্বরও ছিল। নাথুরাম ভেবেছিল, মহেশ্বরের বিশাল চেহারা এবং তার মস্ত দাঁত দুটো দেখেই বুনো হাতীরা ভয় পেয়ে যাবে। তখন তাদের বাগে আনা সহজ হবে। সাধারণতঃ হয়ও

তাই। একটা দুটো বড় দাঁতাল হাতী সামনে থাকলে, খেদায়-পড়া নতুন হাতী বশ করা সোজা হয়। কিন্তু মহেশ্বরকে এই কাজের মধ্যে টেনে এনে নাথুরাম ফ্যাঁসাদ বাধালে।

মহেশ্বর ছিল খেদা থেকে মাইল-খানেক তফাতে। হাতীর দলের করুণ চীৎকার তার কানে আসছিল—তাতে তার মনটা মাঝে মাঝে কেমন বিগড়ে যাচ্ছিল। এমন সময় মংলা এসে তার পায়ের শিকল খুলে দিয়ে, কাঁধের উপর বেয়ে উঠল। আরও বারোটা পোষা হাতী, তার সঙ্গে শিকল, দড়িদড়া, প্রভৃতি নিয়ে চল্‌ল। মহেশ্বর বুঝতে পারল হতভাগ্য বন্দীগুলোকে বশ করা হবে, এ হচ্ছে তারই আয়োজন। মানুষের চাল-চলন তার ত আর অজানা নয়!

খেদার দরজা খোলা হ'লে, পোষা হাতীগুলো একে একে খেদার মধ্যে ঢুকে প'ড়ল। মহেশ্বর ছিল সামনে—অন্য হাতী-গুলো তার পিছনে পিছনে লাইন ক'রে। এইবার একটা একটা ক'রে বড় হাতীগুলোকে আগে বেঁধে ফেলা হবে। মংলা, মহেশ্বরের শুঁড়ের কাছে মোটা এক গাছা কাছি এগিয়ে দিয়ে, একটা দাঁতাল হাতীকে বাঁধতে হুকুম করল। মহেশ্বর গোঁ-ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল—হুকুম তামিল করবার ইচ্ছে তার মোটেই নেই। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগ্‌ল। আর তার কুলোর চেয়েও বড় কান দুটো বার কয়েক ফটাফট্‌ করল।

কথা শুনল না দেখে মংলার রাগ হয়ে গেল। এক-ঘা ডাঙ্গশ মেরে, হুকুম তামিল করতে বল্‌ল। আর যায় কোথা! ডাঙ্গশ মারবার সঙ্গে সঙ্গে, মহেশ্বর এমন গা-ঝাড়া দিল যে, মংলার মত পাকা মাহুত তার কাঁধের উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেল। আর একটু হলেই মহেশ্বরের পায়ের তলায় তার ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছিল, নেহাৎ পরমায়ু ছিল—তাই সে কোনও গতিকে খেদার বাইরে পালিয়ে এসে বেঁচে গেল।

বে-গতিক দেখে, লোকজনেরা খেদার দরজা ফেলে দিল। দরজাটা ইঁদুর-ধরার বাক্স-কলের দরজার মত একটা শক্ত দড়িতে ঝোলে। দড়ি কেটে দিলে, ভারী দরজা ধপাং ক'রে প'ড়ে খেদার মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়।

এ দিকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, হাতের শিকার মংলাও একটুর জন্যে ফস্‌কে গেল, মহেশ্বর আরও ক্ষেপে উঠ্‌ল। তার মাথার ভিতরে তখন আগুন জ্বল্‌ছে, দু-চারটে খুন-জখম, অন্ততঃ কিছু একটা ভেঙ্গে চূরে চুরমার না করতে পারলে সে আগুন নিব্‌বে না।

দরজাটা চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল, আর সে খেদার মধ্যে আটক পড়ে গেল, কাজেই মহেশ্বরের প্রথমেই রাগ হ'ল ঐ দরজাটার উপর। অমনি দরজা ভাঙ্গতে এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজার গায়ের মোটা মোটা ছুঁচলো পেরেকের খোঁচা খেয়ে পিছিয়ে এল। ওদিকে সুবিধে হ'ল না। খেদার ভিতর দিকে ঐ রকম ছুঁচলো মুখ-বের-করা পেরেক

সর্ব্বত্র। মাথা ঠিক করে এদিক-ওদিক ভাল করে চেয়ে দেখল। একটা খুব মোটা খুঁটিতে পেরেক ছিল না। খুঁটিটা খুবই শক্ত, হাতীতে তার কিছু করতে পারবে না ভেবে, আর পেরেক লাগানো হয় নি। মহেশ্বর সেই খুঁটিটাতেই কাঁধ লাগিয়ে চাপ দিল। প্রথম চাপেই খেদা কেঁপে উঠ্‌ল, দ্বিতীয় চাপে খুঁটি কাত হ'য়ে পড়ল। তারপর আর এক চাপ দিতেই খুঁটি মড়্‌মড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে গেল।

মহেশ্বরকে আর পায় কে। সে কেবল নিজের স্বাধীনতা পেলেই খুশী নয়—পোষা হাতীগুলোকে গুঁতিয়ে খেদা থেকে বের ক'রে দিতে লাগল। একটা দাঁতাল,—বোধ হয় সে নাথুরামের নিমক কিছু বেশী ক'রে খেয়েছিল,—সেই জন্যে তখনও প্রভুভক্তি দেখিয়ে বাহবা নেবার ইচ্ছেয়—মহেশ্বরকে তেড়ে এল। মহেশ্বর তার পাঁজরে দাঁত দিয়ে মারল এক ঘা, তাতেই সে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। আর কোন হাতী তার দিকে এগলো না।

বুনো হাতীর দল এতক্ষণে ছুটোছুটি ক'রে বাইরে এসে শুক্‌নো নদীর খাড়ি পথ ধ'রে যে যে-দিকে পারল দৌড় দিল। লোকজনও প্রাণের ভয়ে কেউ গাছে উঠে, কেউ-বা পালিয়ে বাঁচল। সমস্তই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, —তবে এ যাত্রায় কারও প্রাণহানা হয়নি—এই টুকুই যা সান্ত্বনা।

খেদার সমস্ত হাতীগুলোই বেরিয়ে গেল, কয়েকটা

পোষা হাতীও বনে পালিয়ে গেল। মহেশ্বর ত হাতছাড়া হ'লই,— নাথুরামের কত হাজার টাকা যে নষ্ট হ'ল তা বলা যায় না। বেচারা ভেবেছিল, হাতী-খেদা ক'রে রাতারাতি বেশ কিছু লাভ করবে, তা খুবই হ'ল—একেই বলে অতি লোভে তাঁতি ডোবে। আর মহেশ্বরও কিছু শোধ তুল্‌ল বৈকি।

বার

ঘাড়ে একবার ভূত চাপলে, সহজে সে আর নামতে চায় না। মহেশ্বরের ঘাড়েও ভূত চাপল সে মানুষের তৈরী সবকিছু ভেঙ্গে চূরে একাকার ক'রে দেবে। তাদের তৈরী কিছু আর সে রাখবে না—সে গুণ্ডা হয়ে গেল।

পশ্চিম মুখো চলতে চলতে, পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ধনস্থই নদীর কাছে এল। লোকজনের বসতি নেই—জঙ্গলের মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও কুকি, নাগা, মিস্‌মি, এই সমস্ত পাহাড়ীদের ঘরবাড়ী। এ সমস্ত ভাঙ্গবার প্রবৃত্তি মহেশ্বরের নেই। মহেশ্বরের রোখ চেপেছে, সে মানুষদের এক হাত দেখে নেবে—আর, মানুষ বলতে মহেশ্বর বোঝে সভ্য মানুষ, যারা ফিট্‌ফাট্‌ থাকে, রঙ্গীন জামাকাপড় পরে, নানা রকম ফন্দি-ফিকির ক'রে তাদের জঙ্গল-দেশটা লুটে খাচ্ছে। অসভ্য পাহাড়ীরা ত' মহেশ্বরের শত্রু নয়—এদের উপর তার কোন রাগ নেই।

ধনস্থই পার হয়ে, আরও পশ্চিমে গেল—এ দেশে সে আগে কখনও আসে নি। আরও,—আরও এগিয়ে দেখল পরিষ্কার একটা পথ চলে গেছে—টিলার মত কয়টা পাহাড়ের গা-ঘেঁষে। এটা আসাম-বেঙ্গল রেল-পথ। মহেশ্বর জীবনে

আর রেল-পথ দেখে নি, কিন্তু তার মন বলে দিল—এ জিনিস নিশ্চয়ই মানুষের তৈরী।

ভাবছে এটা কি হতে পারে, আর ভাবছে এটাকে গুঁতিয়ে উল্টেপাল্টে ফেলবে কিংবা পা দিয়ে চেপ্টে দেবে কি না, এমন সময় লাইনের উপর দিয়ে একখানা রেলগাড়ী আসতে দেখা গেল। প্রকাণ্ড একটা কালো দৈত্য হুস্‌হুস্ করতে করতে ছুটে চলেছে। পঞ্চাশটা হাতী যেন সার বেঁধে হৈ হৈ ক'রে দৌড়চ্ছে—আর তাদের পায়ের দাপাদাপিতে বনজঙ্গল, এমন কি নীচের মাটি পর্য্যন্ত কাঁপছে। এঞ্জিনের বিদ্‌ঘুটে শব্দ এবং জানোয়ারগুলোর,—অর্থাৎ ট্রেন খানার—দৌড়বার ধরণ তাকে অবাক্ করে দিয়েছিল। সে লাইন থেকে তফাতে সরে গেল।

ট্রেনটা অনেক দূরে চলে গেল, তখনও তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দ ক্রমে কম হ'তে হ'তে, চারিদিক্ যেমন চুপচাপ ছিল, আবার সেই রকম চুপচাপ হয়ে গেল। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা মহেশ্বরের কেমন অদ্ভুত মনে হ'ল। অনেকক্ষণ পরে সাহস করে সে লাইনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল—সম্পূর্ণ সাহস তার তখনও ফিরে আসে নি।

ঘণ্টা তিনেক পরে আবার একখানা ট্রেন সেখান দিয়ে চ'লে গেল। মহেশ্বর এবার শুঁড় উঁচু ক'রে, ট্রেনখানার গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করল—কিছুই বুঝতে পারল না। এর পর তৃতীয় ট্রেনখানা চলে যাবার সময় সে লাইনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল—জন্তুটা তাকে তাড়া ক'রে আসে কিনা পরখ করবার জন্যে।

আশ্চর্য্য, জানোয়ারটা তাকে তেড়ে ত' এলই না—তার দিকে ফিরেও তাকালো না—ঘষ্‌-ঘষ্‌ ক'রতে ক'রতে সোজা চলে গেল। মহেশ্বর এবার লাইনের অনেক কাছে এসেছিল, ট্রেনের ভিতরের যাত্রীদেরও দেখতে পেল। সে আরও অবাক্ হয়ে গেল—এ জানোয়ারও তা হ'লে মানুষের চাকর!

রাতের দিকে ট্রেন চলাচল ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে মহেশ্বর লাইনের পাশ ধ'রে চল্‌তে আরম্ভ করল। অদ্ভূত জানোয়ারটা অতগুলো মানুষ নিয়ে কোথায় গেল দেখতে হবে। যেখানে দাঁড়িয়ে মহেশ্বর ট্রেন দেখেছিল, সেখান থেকে লামডিং ষ্টেশন তিন মাইলের বেশী নয়। কাজেই অল্পক্ষণ পরে সে ষ্টেশনের কাছে এসে পৌঁছল। ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে একটা লাইনের উপর খান-কয়েক খালি গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। মহেশ্বর বেশ ক'রে দেখল জানোয়ার কয়টা এক জায়গাতেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোনও জন্তুই ত এত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। অন্ততঃ মহেশ্বর কখনও এ রকম জন্তু দেখে নি। সে এক পা এক পা ক'রে সাবধানে কাছে গেল—জানোয়ারগুলো তেড়ে এল না—এক পা নড়্‌লও না। শুঁড়ের আগা দিয়ে গাড়ী কয়খানা ছুঁয়ে দেখল—একেবারে পাথরের মত ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা কোনও জানোয়ার হতে পারে না! এটা তা' হ'লে নিশ্চয়ই কোন জন্তু-জানোয়ার নয়—মানুষের তৈরী কিছু একটা জিনিস।

যেই মনে হ'ল, মানুষের তৈরী একটা-কিছু অমনি তার রাগ চেপে গেল। নিকটের গাড়ীখানাকে এক ধাক্কা দিল,—সে ওটাকে উল্টে দিতে চায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ধাক্কা মারলে ঘরবাড়ী যেমন মড়্‌মড়্‌ ক'রে ভেঙ্গে পড়ে এ জিনিস সে রকম ভেঙ্গে পড়ল না, গড়্‌গড়িয়ে লাইন দিয়ে দৌড় দিল। আর কিছুক্ষণ এই রকম দৌড় দিলে, মহেশ্বর বোকা ব'নে যাচ্ছিল। কিন্তু ধাক্কার বেগ কমে গেলে, গাড়ী থেমে গেল দেখে সে বেশ বুঝতে পারল. কাঠের কারখানায় কাজ করবার সময় তারই ধাক্কায় মোটা মোটা গাছের গোড়া পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যেত, এ-ও সেই রকম হ'ল। রেলগাড়ীর গতিবিধি সম্বন্ধে তার মাথা ক্রমেই পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌ছে। সে এগিয়ে গিয়ে আবার এক ধাক্কা লাগালো। গাড়ী এবার লাইন থেকে বেরিয়ে কাত হয়ে পড়্‌ল। খুব খানিক ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠ্‌ল—এতে সে ভয় পেল না। নিজের কৃতিত্বে বরং খুশীই হ'ল।

এক দিনের গবেষণায় সে অনেক জ্ঞান লাভ করেছে। মাথায় কেবলই ঘুরছে আর কি ভেঙ্গে চুরে দেওয়া যায়। কাছেই দেখে একটা টেলিগ্রাফের খুঁটি। এক ধাক্কা! অমনি টেলিগ্রাফের তার সমেত খুঁটি হেলে পড়্‌ল।

পরদিন ষ্টেশনে মহা গোলমাল। রাতে বুনো হাতী এসে গাড়ী উল্টে দিয়েছে, টেলিগ্রাফের খুঁটি ভেঙ্গেছে!

ষ্টেশন মাষ্টার, মাল-বাবু, তার-বাবু, কুলী—সকলে হট্টগোল করতে করতে যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা এবং মন্তব্য ক'রেছিল মহেশ্বরের কানে সে সব অবশ্য পৌঁছয় নি, কিন্তু সে নিকটেই জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে লোকজনের ভীড় দেখ্‌ছিল, আর হয়ত, মনে মনে বল্‌ছিল "এখনই হয়েছে কি, দু-দশ দিন সবুর কর, আরও কি করি দেখ্‌বে!"

অভিজ্ঞতা থেকে মহেশ্বর বুঝেছে গাড়ী ওল্টানোর চেয়ে টেলিগ্রাফের খুঁটি ভাঙ্গা ঢের সোজা। আর বুঝেছে লণ্ডভণ্ড করার অভিযানে দিনের বেলায় না বেরিয়ে রাতে বেরোনই ভাল।

এখন থেকে আসাম-বেঙ্গল রেল-লাইনে ক্রমাগতঃ হাতীর উৎপাত স্বরু হ'ল। দিনকয়েক চুপচাপ; আবার এক রাত্তিরে গোটা-কয়েক খুঁটি ভেঙ্গে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়।

টেলিগ্রাফের খুঁটি ভাঙ্গা এক-ঘেয়ে লাগছে, এই রকম মনের অবস্থায় এক রাত্তিরে লাইনের অনেকগুলো কাঠের শ্লিপার উল্টে দিয়ে গেল। লাইন জখম হওয়ার ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে থাক্‌ল। রেল-কর্তৃপক্ষ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এ-দেশ সে-দেশ থেকে বড়বড় শিকারী এলেন গুণ্ডা হাতী মারবার জন্যে। কিন্তু গুণ্ডা হাতীর সন্ধান পাওয়া গেল না। সে বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকে—সকলেই মনে করে, হাতী এ দিক থেকে চলে গিয়েছে; হঠাৎ এক রাত্তিরে এসে আবার উৎপাত ক'রে রাতারাতি

জঙ্গলে চলে যায়। সমস্ত শীতকাল ধ'রে মহেশ্বরের এই কাণ্ড চল্‌ল। শিকারীরা লোকজন নিয়ে জঙ্গল ভাঙ্গলেন, পাহাড়ীরা বখ্‌শিসের লোভে এখানে ওখানে বাঁশের ঝাড়ে, কলাগাছে এবং হাতীতে আর যে সমস্ত গাছ খেতে ভালবাসে সেই সমস্ত গাছে বিষ মাখিয়ে রাখ্‌ল। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস কাটল, কিন্তু মহেশ্বরের কেউ-ই কিছুই করতে পার্‌ল না।

চৈত্র মাসের শেষাশেষি গরম পড়্‌তে আরম্ভ হ'ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জঙ্গলের গাছ-পালার পাতা ঝ'রে গেল। ন্যাড়া জঙ্গলে মহেশ্বরের লুকিয়ে থাকার অসুবিধে হয়ে উঠ্‌ল —সে উত্তর দিকের পথে অজানা দেশের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত আর কোন উৎপাত নেই দেখে সকলেই ভাব্‌ল, যাক্ গুণ্ডাটা নিশ্চয়ই মরেছে,—অন্ততঃ এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

তের

গ্রীষ্মের পর বর্ষা ফি বছর যেমন হয়ে থাকে, এ বছরও তেমনি বর্ষা নাম্‌ল। মহেশ্বর দক্ষিণ মুখে ফির্‌ল। বনের পর বনের শেষ নেই, এক পাহাড় পার হয়ে আর এক পাহাড়। —সে মণিপুরের সীমানায় উপস্থিত হ'ল। এ অঞ্চল কিন্তু তার কাছে নতুন। প্রথমেই দেখে পাহাড়ের গায়ে গায়ে নাগা চাষীরা চাষ করেছে। ক্ষেতে ধানের গাছ হয়েছে। পেট ভ'রে ধান গাছ খেল, আর মনের আনন্দে চার পা দিয়ে চাষ নষ্ট করল—তারপর ভোর হলে জঙ্গলে চলে গেল। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারই খানিকটা দূরে পরিষ্কার পাকা রাস্তা। এ রাস্তা দিয়ে মোটর-বাস্‌ যাতায়াত করে। রাস্তাটা হচ্ছে মণিপুর রোড। ষ্টেশন থেকে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল যাবার রাস্তা। রেলের ষ্টেশনের নাম মণিপুর রোড। এর আসল নাম 'ডিমাপুরা'। মহাভারতে যে হিড়িম্বার কথা পাওয়া যায়, সেই হিড়িম্বার বাড়ী এই ডিমাপুরায়।

ইম্ফল যাবার রাস্তা এবং রাস্তার আশে পাশের দৃশ্য খুবই সুন্দর। রাস্তার দু'ধারের জঙ্গল এত ঘন যে দিনের বেলায়ও তার মাঝে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে। কোথাও খাড়া উঁচু পাহাড়, কোথাও নদী, কোথাও ঝরনা, কোথাও

এক মুহূর্ত্তে বাস্‌টাকে উল্‌টে দিয়ে······ ৬২

বা গভীর খাদ। জঙ্গলে বাঘ, বুনো শূয়োর, বুনো কুকুর প্রচুর। তা' ছাড়া দলে দলে হাতী।

এই ধরণের পাকা রাস্তা মহেশ্বর আর কখনও দেখে নি। সে চেনে জঙ্গলের পথ,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। রাস্তা দেখে, সে আর কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝ্‌ল যে, এ-ও মানুষের তৈরী জিনিস।

বেলা হ'লে,—দেখল, একখানা মোটর বাস্‌ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। মোটর বাস্‌ও মহেশ্বরের কাছে নতুন জিনিস। চেহারাটা, তার আগের-পরিচিত রেলগাড়ীর মত নয়, এবং তার তর্জ্জন-গর্জ্জনও তত জোরালো নয়। মহেশ্বর বাস্‌-খানার দিকে তেড়ে গেল। বাস্‌ থেমে গেল, কারণ পাশ কাটিয়ে যাবার মত চওড়া রাস্তা নয়। লোকজন ভয়ে চীৎকার করতে করতে যে যে-দিকে পারল পালালো। এক মুহূর্ত্তে বাস্‌টাকে উল্‌টে দিয়ে সমস্ত লণ্ডভণ্ড ক'রে মহেশ্বর বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে গাছপালা খেতে খেতে জঙ্গলে ঢুকে গেল। মনে মনে ভাবছিল ট্রেন ওল্‌টানোর চেয়ে বাস ওল্‌টানো ঢের সোজা।

পথে আরও কিছু কিছু গুণ্ডামি করতে করতে সে আসাম-বেঙ্গল রেল-পথের দিকে এগুতে লাগ্‌ল। এ দিক্‌কার পথ তার চেনা পথ না হ'লেও আন্দাজে আন্দাজে সে চলেছে।

ভোরে, বনের মধ্যে ছোট একটা নদীতে স্নান সেরে, আচ্ছা ক'রে কাদা মেখে, খানিক বিশ্রাম ক'রে আবার সে ধীরে সুস্থে চল্‌তে আরম্ভ করল। চল্‌তে চল্‌তে শেষে সে তার সেই আগের পরিচিত রেল-লাইনের কাছে এল।

অনেক দিন কোন উপদ্রব হয় নি। কিন্তু যারা বুনো গুণ্ডা-হাতীর স্বভাব জানে তাদের বরাবরই ভয়, আবার কবে উৎপাত আরম্ভ হবে। রেলের কর্ত্তৃপক্ষ লাইনের দুই ধার দিয়ে খাদ কাটিয়ে রেখেছিলেন। হাতীতে এ-রকমের খাদ পার হতে পারে না—কেননা, হাতী ছুট্‌তে পারে, লাফাতে পারে না। মাঝে মাঝে শক্ত বেড়াও দেওয়া হয়েছিল—বেড়ার বাইরের দিকে তীরের ফলার মত বাঁশের ফলা। মাটিতেও অনেক জায়গায় শাল, সেগুন এবং বাঁশের গোঁজ পোঁতা হয়েছিল—এ রকম ছুঁচলো গোঁজের উপর দিয়ে হাতী চল্‌তে পারে না।

মানুষের বুদ্ধির কাছে তাকে হার মান্‌তেই হ'ল। অনেক চেষ্টা করেও সে আর লাইনের কাছে এগুতে না পেরে জঙ্গলে ফিরে গেল।

চোদ্দ

অনেক দিন মল্লিক সাহেবদের খবর নেওয়া হয় নি। আসাম-বেঙ্গল রেল-পথে গুণ্ডা হাতীর উপদ্রবের কথা সকলেই শুনেছে। রেল-লাইন থেকে কারখানার বাংলো অনেক দূর হ'লেও এই উপদ্রবের খবর মল্লিক সাহেবরাও শুনেছেন। বীণা বলে, এ হাতী মহেশ্বর না হ'য়ে যায় না। এ বার মল্লিক সাহেবেরও আন্দাজ তাই। তবে তিনি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি মহেশ্বর এ-রকম ভীষণ দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা হ'ল কি ক'রে। বুনো হাতী যতক্ষণ দলে থাকে গুণ্ডা হয় না। দলছাড়া হ'লে দাঁতাল হাতী অনেক সময় গুণ্ডা হয়ে যায়। সে রকম গুণ্ডার অত্যাচার সাধারণতঃ দু'দশ দিনের বেশী হয় না। এ হাতী যেন মতলব এঁটে গুণ্ডামি করছে মনে হয়। এক সময় এ মানুষের কাছে থেকে বিদ্যে বুদ্ধি শিখেছে, তারপর গুণ্ডামি করছে—তা' না হ'লে এমনটা হয় না।

পোষা হাতী, মানুষের কাছে নির্য্যাতন পেয়ে, কোনও গতিকে বুনো হ'য়ে গেলে, অনেক সময় যে বে-পরোয়া গুণ্ডা হয়ে ওঠে, তা ঠিক। কিন্তু মহেশ্বর যত দিন বোস্‌ সাহেবের কাছে ছিল, তত দিন খুব যত্নেই ছিল। তবে,

মহেশ্বর এমন গুণ্ডা হ'ল কেন, তার কারণ অনেক দিন পর্য্যন্ত মল্লিক সাহেব আন্দাজ কর্‌তে পারেন নি। শেষে অন্য একটা ঘটনা থেকে মহেশ্বরের গুণ্ডা হওয়ার কারণ কতকটা বোঝা গেল।

কারখানার কাজ তদারক ক'রে বাংলোয় ফিরে মল্লিক সাহেব শুনলেন, তিন দিনের পথ থেকে জন কয়েক পাহাড়ী তাঁর কাছে এসেছে। তারা বল্‌ছে, তাদের গ্রামে একটা বাঘ ভয়ানক অত্যাচার করছে। গোরু, মোষ মেরেছে, একজন মানুষকেও দিনের বেলায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।

লোকজন, হাতী, তাঁবু, বন্দুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে, পরদিন মল্লিক সাহেব পাহাড়ীদের গ্রামে রওনা হ'লেন। বছরে দু'এক বার তাঁকে এরকম বাঘ-শিকারে যেতে হয়।

সেখানে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে বাংলোয় ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, চট্‌পট্‌ একটা হেস্ত নেস্ত করা দরকার। ঠিক হ'ল গর্ত্ত কেটে, বাঘ ধরবার চেষ্টা করা হবে। এ ভাবে বাঘ-শিকার কর্‌তে হলে, গভীর গর্ত্ত কেটে তার উপরটা চেরা-বাঁশ এবং ডাল পালা দিয়ে ঢেকে, সেখানে ছাগল অথবা অন্য কোন শিকার বেঁধে রাখা হয়। নির্জ্জন জায়গায় বে-ওয়ারিশ শিকার পেয়ে, বাঘের নিশ্চয়ই খুব লোভ হয়। তারপর শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেই, বাঘের ভারে ঢাক্‌নির বাঁশ ভেঙ্গে বাঘ গর্ত্তে প'ড়ে যায়।

গর্ত্ত কাটার কথা ঠিক হ'লে গ্রামের লোকেরা বল্‌ল, বছর দুই আগে একটা হাতী ধরার জন্যে গর্ত্ত কাটা হয়েছিল, সেই গর্ত্তে যদি কাজ চলে, তা হ'লে নতুন ক'রে আর গর্ত্ত কাটার হাঙ্গামা করতে হয় না। খোঁজ-খবর নিয়ে মল্লিক সাহেব যা শুন্‌লেন তাতে তাঁর খুব সন্দেহ হ'ল, নাথুরাম এখানে এসে মহেশ্বরকে ধ'রেছিল। তাই যদি হয়, সে তাঁদের কোম্পানীর হাতী-চোর। তার হাত থেকে, পালাবার পর মহেশ্বর যদি গুণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তার গুণ্ডা হওয়ার জন্যে নাথুরামই দায়ী। তাঁর এ সন্দেহ তিনি আপাততঃ নিজের মনে রেখে, সে যাত্রায় বাঘ মেরে তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে এলেন।

তাঁর সন্দেহের কথা শিলংএর পুলিশকে জানালে, পুলিশ নাথুরামকে নিয়ে খুব টানা-হ্যাঁচড়া আরম্ভ করল। অনুসন্ধানের ফলে যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল, তা' থেকে নাথুরাম স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, সে বছর দুই আগে গর্ত্ত কেটে একটা বড় দাঁতাল হাতী ধরেছিল, তবে সেটা একটা বুনো হাতী, মহেশ্বর নয়। মহেশ্বরকে সে চিন্‌ত, সে হাতী মহেশ্বর কখনই নয়।

পুলিশ জিজ্ঞেসা করল, সে হাতী এখন কোথায়?

নাথুরামের জবাব ঠিক করাই ছিল; বল্‌ল—ধরবার মাস দুই পরে এক সাহেবের কাছে তাকে বিক্রী করে দিয়েছি।

নাথুরাম বোকা নয়। পুলিশ তাকে কি কি কথা জিজ্ঞেসা করতে পারে, আন্দাজ ক'রে তার জবাবও সে ঠিক করে

রেখেছিল। এত বড় একটা কাণ্ড করবার আগে, আট-ঘাট বেঁধেই করেছে—হাতে কলমে ধরা পড়বার কোন প্রমাণ রাখে নি। সে জানে চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।

পুলিশ আরও প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগল। তারাও না-ছোড়-বান্দা। এখানে সেখানে তদন্ত ক'রে এবং মাঝে মাঝে এসে নাথুরামকে জেরার উপর জেরা ক'রে হয়রান করল। মল্লিক সাহেব উৎসাহী হ'য়ে পুলিশকে নানা রকমে সাহায্য করলেন।

আরও কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ হলে, নাথুরামের নামে হাতী-চুরীর মামলা হ'ল। তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আদালতেও হাজির করা হ'ল। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা গেল না যে, যে-হাতী সে ধ'রেছিল সে মহেশ্বর। সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে বিচারকের কাছে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা গেল না—কাজেই শেষ পর্য্যন্ত নাথুরামের কোন শাস্তি হ'ল না।

পনের

নাথুরাম বে-কসুর খালাশ পেয়ে গেল। মহেশ্বরকে সে এক সময় কিনতে চেয়েছিল। বোস্‌ সাহেব তাকে বিক্রী করতে চান নি, সেই রাগে সে বোস্‌ সাহেবকে জব্দ করবার জন্যে মহেশ্বরের দাঁত দুটো কেটে নেবার মতলব ক'রেছিল। সে, অনেকদিন আগের ঘটনা। এবার পুলিশের হাঙ্গামায় প'ড়ে, তার রাগ হ'ল বেশী করে মল্লিক সাহেবের উপর। তিনি এর মাঝে না থাক্‌লে পুলিশে কিছু আর আপনা থেকে তাকে হাতী চুরির মামলায় জড়াতো না। আর এমন ক'রে নাকানি-চোবানিও খেতে হ'ত না।

নাথুরাম হাড়ে-হাড়ে চালাক। মল্লিক সাহেবের উপর তার বিন্দুমাত্র রাগ হয়েছে—এমন ভাব বাইরে প্রকাশ হ'তে দিল না। এমন কি, আগের চেয়ে এখন সে তাঁকে বেশী বেশী করে খাতির দেখাতে লাগল—হাটে বাজারে কোথাও দেখা হ'লে খুব লম্বা লম্বা সেলাম ঠোকে, আর এমন ভাব দেখায় যেন সে তাঁর দাসানুদাস—কেনা গোলাম। একেই বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

মাস ছয়েক এই ভাবে কেটে গেল। আবার একদিন মংলার ডাক পড়্‌ল নাথুরামের কাছে। থোক পাঁচশো টাকা বখ্‌শিস পাবে,

ঠিক হ'ল যদি সে মল্লিক সাহেবের বাংলো থেকে তাঁদের মেয়ে খুকীকে চুরি ক'রে আনতে পারে। এক সঙ্গে পাঁচশো টাকা, মংলা ভাবতেও পারে না। নাথুরামের জিদ, যেমন করেই হ'ক এ কাজ তাকে করতেই হবে, তাতে যত টাকা লাগে লাগুক। নাথুরাম চায়, এতবড় ভয়ানক কাজটা মংলাকে দিয়ে করাবে, নিজে ধরা-ছোঁয়ার মাঝে থাকবে না—পুলিশের ভয় আছে। চারিদিকে লোকজনের চোখ এড়িয়ে বাংলো থেকে খুকীকে চুরি করা সোজা কাজ নয়—মংলারও ধরা পড়ার ভয় আছে।

দু'জনে মিলে মোটামুটি এক মতলব আঁটল। মল্লিক সাহেব এবং বীণা মাঝে মাঝে হাতী চ'ড়ে জঙ্গলে বেড়াতে যান। খুকী তখন আয়ার কাছে থাকে। আয়াকে হাত করতে পারলে কাজ সোজা হয়। কিন্তু নাথুরাম আর-কাউকে এর মাঝে আন্‌তে চায় না—ব্যাপারটা তাতে প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। খুকীকে চুরি ক'রে এরা মেরে ফেল্‌তে সাহস করে না। ধরা পড়্‌লে ফাঁসী-কাঠে ঝুল্‌তে হবে। দূরে কোথাও কোন গভীর জঙ্গলে তাকে ছেড়ে দেবে, তার পর বাঘ-ভালুকে খেয়ে ফেল্‌বে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না।

সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌—পাকা কথা হয়ে গেল। মংলা কিছু টাকা আগাম নিয়ে, খেয়ে দেয়ে ফূর্তি কর্‌তে লেগে গেল। আর মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে গোপনে গোপনে কারখানার বাংলোর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়—ফাঁক পেলেই খুকীকে নিয়ে পালাবে।

তখন বিকেল বেলা। মল্লিক সাহেব জঙ্গলে গাছ কাটার তদারকে গেছেন, বাংলোয় ফিরবার সময় হয় নি। খুকী নিজের মনে ঘুরে ফিরে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আয়া ব'সে একমনে উল দিয়ে কি-একটা বুনছে। এই সময় রোজই প্রায় সে খুকীকে খেলা কর্‌তে ছেড়ে দিয়ে উল বোনে। কেউ জানে না, আজ মংলা নিকটেই হিংস্র বাঘের মত শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে।

খুকী তার খেলার গাড়ীতে পুতুল বসিয়ে মহা আনন্দে গড়্-গড়্ ক'রে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গাড়ী টান্‌তে টান্‌তে বনের দিকে একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছে। আয়া উল বোনায় মত্ত—খুকীর দিকে তত খেয়াল নেই—অভ্যাস মত কেবল সে মাঝে মাঝে "খুকী"—ব'লে ডেকে সাড়া নিচ্ছে।

বার-কয়েক এই রকম "খুকী"—"খুকী" ক'রে ডেকে, আয়ার মনে হ'ল অনেকক্ষণ খুকীর সাড়া পাওয়া যায় নি। সামনে, পাশে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোথাও খুকী নেই। দৌড়ে বাংলোয় গেল, সেখানেও খুকী নেই। খোঁজ-খোঁজ প'ড়ে গেল, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। খুকীর মা বীণার দুশ্চিন্তার শেষ নেই,—জঙ্গলের দিকে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন। মল্লিক সাহেব বাংলোয় ফিরে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে গেলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। যারা খুঁজতে বেরিয়েছিল, অনেক রাত্রে তারা একে একে ফিরে এল, খুকীর সন্ধান হ'ল না।

খুকীকে বাঘে নিয়ে গেছে,—প্রথমে সকলের এই কথাই

মনে হয়েছিল। কিন্তু, তা' যদি হ'ত যে রকম তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, তার মৃত দেহ পাওয়া যেত নিশ্চয়ই। রক্তের দাগ, বাঘের পায়ের চিহ্ন, খুকীর কাপড়-চোপড় কিছুই কোথাও পাওয়া গেল না। উদ্বেগ আর দুর্ভাবনায় সে রাত্রিতে কারও ঘুম হ'ল না।

পরদিন সকলে আবার খুঁজতে বেরুলো। মল্লিক সাহেব এবং বীণাও একটা হাতীতে চ'ড়ে বেরুলেন—ফল কিছুই হ'ল না। ক্রমে সকলের এই ধারণাই হ'ল যে, খুকীকে কোন হিংস্র জন্তুতে নিয়ে যায় নি।

মল্লিক সাহেব যতই ভাবছিলেন, ততই তাঁর মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই এ নাথুরামের কাজ। এই মাস-কয়েক আগে হাতী-চুরীর মামলায় প'ড়ে তার অনেক দুর্গতি হয়েছে। নাথুরাম সেই রাগে হয় ত এই কাণ্ড করিয়েছে, খুকাকে সে চুরী করিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাকে কি সে মেরে ফেল্‌ল—না, কোথাও আট্‌কে রেখেছে ?

এই সমস্ত এলো মেলো কত কি ভাবতে ভাবতে তাঁর স্থির মাথা অস্থির হয়ে উঠল। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, এই মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে নাথুরামের টুটি টিপে ধরবেন। যদি সে খুকীকে ফিরিয়ে না দেয়, নাথুরামকে তিনি গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌বেন। তারপর যা হয় হবে। দুর্দ্দান্ত কল্পনা শান্ত হ'লে ভাবলেন এ সমস্ত কি যা' তা' পাগলের মত ভেবে সময় নষ্ট কর্‌ছেন।

তিনি বাংলোর ভিতর কামরায় ঢুকে দেখেন বীণা এ-ঘর-ওঘর ক'রে বেড়াচ্ছে।

খোল

পুতুল নিয়ে গাড়ী-গাড়ী খেল্‌তে খেল্‌তে খুকী অনেক খানি দূরে চলে গেল—এ-রকম সে গিয়ে থাকে। অন্যদিন হয় সে আয়ার ডাকাডাকিতে নিকটে এসে খেলা করতে থাকে,—না-এলে আয়া তাকে ধরে নিয়ে আসে। এদিন আয়া উল বোনা নিয়ে মেতেছিল। মংলা কাছেই লুকিয়েছিল। আয়ার মন অন্যদিকে, খুকীও তফাতে এসে পড়েছে এই স্থযোগে সে খুকীর উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। এক হাত দিয়ে তাকে জাপ্‌টে ধ'রে, যাতে চেঁচাতে না পারে সেই জন্যে আর এক হাতে মুখ চেপে ধ'রে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। আয়া এর কিছুই জান্‌ল না।

মংলা দৌড়চ্ছে, অসহায় শিশু হাত পা ছুঁড়ছে। এমনি ক'রে ঘন বনে তারা অনেক দূর এগিয়ে পড়্‌ল। বনের পথ এমনিতেই অন্ধকার, তার উপর সন্ধ্যেও হয়ে গেল। নিশাচর প্রাণী ছাড়া এ পথে কেউ চলা-ফেরা করতে পারে না। মংলা সে হিসাবে নিশাচর। তা' না হলে রাতের বেলায় একরকম জঙ্গলে কেউ চল্‌তে সাহসও করে না। এখন সে খুকীর মুখ ছেড়ে দিয়েছে, —সে চীৎকার করে কাঁদ্‌ছে, সে কান্না আর মানুষের কানে পৌঁছনোর সম্ভাবনা নেই। অনেকক্ষণ সে কাঁদ্‌ল, চেঁচালো, মংলাকে দুটো চারটে কিলও মার্‌ল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে দুর্ব্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

মংলা ঘুমন্ত খুকীকে নিয়ে, একটা গাছের উপরে রাত কাটালো। সকাল বেলা খুকীর যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সে আপনা থেকেই অনেকটা শান্ত হয়েছে। এইবার মংলা যত্ন ক'রে তার হাত মুখ ধুইয়ে তাকে দুধ খেতে দিল। কিছু দুধ, চিঁড়ে এবং মিষ্টি সে সঙ্গে করে এনেছিল। এ বনে জলের অভাব নেই, নিজের গামছা ভিজিয়ে খুকীর হাত মুখ মুছিয়ে দিল। খুকীর খুব খিদে পেয়েছিল, যা পেল খেয়ে কতকটা সুস্থ হ'ল।

খুকীকে শান্ত করার দরকার ছিল। কাঁদা-কাটি ক'রে ঝঞ্ঝাট বাধালে তাকে নিয়ে চলা অসুবিধে। মংলা সেই বুঝেই তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল। তাকে খুশী করবার জন্যে একটা গল্পও বল্‌ল—খুকী তার কতক বুঝল কতক বুঝল না। অন্য দিন গল্প শুনতে তার ভাল লাগে - কিন্তু আজ মা-বাবার জন্যে মন খারাপ। সে বল্‌ল—মার কাছে যাব। মংলা তাকে ভোলা-বার জন্যে বল্‌ল—তাই চল, মার কাছে নিয়ে যাই।

খুকী কিছুই বুঝ্‌তে পারছে না—মংলা তাকে ধ'রে আনল কেন। সে যখন তার মুখ চেপে ধ'রে দৌড় দিল, তার বড্ড কষ্ট হচ্ছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল—ভাল করে কাঁদতেও সে পারছিল না। মংলা বড় খারাপ লোক—মার কাছে নিয়ে গেলেই সে মাকে বলে ওকে আচ্ছা রকম বকুনি খাওয়াবে। এই রকম কত কি সে ভাবল।

আরও এক রাত কাটল। মংলা আরও গভীর জঙ্গলে এসে পড়ল। মহেশ্বর গুণ্ডা হয়ে কিছুদিন এই জঙ্গলের আশে পাশে

ঘুরে বেড়িয়েছিল—সে আজ বছর দুই-এর কথা। এখন সে কোথায় কি ক'রে বেড়াচ্ছে কে জানে। সে বার ত সে তাকে মেরেই ফেলেছিল—একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিল।

এই জঙ্গলটা পার হয়ে যেতে তার মত লোককেও নাকাল হতে হ'ল। সে হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। কাঁটা গাছে শরীরের অনেক জায়গায় ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল। খুকীকে নামিয়ে রেখে সে দম নিল। আর খানিকটা যেতে পারলেই পরিষ্কার মাঠ পাওয়া যাবে।

দম নিতে নিতে গায়ের রক্ত মুছ্‌ছে, এমন সময় সামনের খোলা মাঠের ধারে, যা দেখ্‌তে পেল তাতে তার মাথা ঘুরে গেল। মট্‌ মট্‌ ক'রে বাঁশ ঝাড় ভাঙ্গবার শব্দ শোনা গেল। তার পরই চোখে পড়ল, প্রকাণ্ড এক দাঁতাল হাতী। মহেশ্বর মনের আনন্দে বাঁশের কোঁড় ভাঙ্গছে আর খাচ্ছে।

এতক্ষণে মংলার হুঁস হ'ল যে সাক্ষাৎ যমের হাতে সে প'ড়েছে—এবার আর নিস্তার নেই। মহেশ্বরের উপর যত অত্যাচার করেছে, আজ সে তার শোধ তুল্‌বে। মংলা একটা মোটা গাছের আড়ালে গেল। সেখান থেকে এ গাছের ও গাছের মাঝ দিয়ে পালাতে লাগল। মহেশ্বর, বাঁশের কোঁড় মহা আনন্দে খেয়ে শুঁড় উপরে তুলে একটা চীৎকার দিল। সে যেন মংলাকে দেখেও দেখছে না। মনে মনে কিন্তু বেশ জানে এবার আর পালাবার জো নেই। মংলা খুকীকে ফেলে, যে পথে এসেছিল, সেই মুখো ফিরে দৌড় দিল। কাঁটা-

বন, বেশীদূর এগুতে পারল না। মহেশ্বর তাড়া করে আসছে, আর সে পালাতে চেষ্টা করছে। পাঁচ-দশ-পনের মিনিট এই ভাবে কাটল—মহেশ্বর মাঠ পার হ'য়ে এসে পড়েছে। মংলা প্রকাণ্ড একটা গাছের ডাল ধ'রে উপরে উঠে গেল। মহেশ্বর ঝড়ের মত ছুটে এসে শুঁড় দিয়ে ডালটা ভেঙ্গে ফেল্‌ল। মংলা ছিট্‌কে একেবারে তার পায়ের কাছে পড়্‌ল। পরক্ষণেই মহেশ্বরের সামনের পায়ের এক চাপে তার সব শেষ হয়ে গেল।

কি ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল। খুকী তা কিছু বুঝল না—তার বোঝ্‌বার বুদ্ধি হয় নি। সে শুধু দেখ্‌ল একটা হাতী। হাতী সে চেনে। মাঝে মাঝে কারখানায় শান্ত-শিষ্ট হাতীতে উঠে বেড়াতে যেয়ে থাকে। মংলা তাকে ধ'রে আনবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত কোন জানাশুনো জিনিস তার চোখে পড়ে নি। এখন একটা জন্তু সে দেখ্‌তে পেলে যে জন্তু সে চেনে, যার পিঠে উঠে সে বেড়ায়, নিজের হাতে যাকে খেতে দেয়। জন্তুটা অত বড় হ'লেও তার ভয় হ'ল না। সে মহেশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল—তাকে ডাক্‌তে লাগল।

দুর্গম জঙ্গলে এ শব্দ মহেশ্বরের কাছে অদ্ভুত লাগল। সে থমকে দাঁড়ালো। অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া একটা অস্পষ্ট ছবি তার মনে ভেসে উঠল। এই রকমই একটা ছোট্ট মেয়ে তার শুঁড় ধ'রে টেনে বসাতে চেষ্টা কর্‌ত। খুকী আরও একটু এগিয়ে এলে, মহেশ্বর শুঁড় দিয়ে তাকে বারবার ছুঁয়ে দেখতে লাগল। তার গায় মানুষের গন্ধ, কিন্তু যে মানুষের অত্যাচারে তার মন

বিষাক্ত হয়ে আছে, এ সে রকম গন্ধ নয়। তার বাচ্ছাকালে এমনি একটা ছোট্ট মানুষ তাকে আদর ক'রে খেতে দিত। মাঝে মাঝে রেগে শুঁড়ের উপর কিল-চড় মারত—তার কত ভাল লাগত। মহেশ্বরের সে দিনগুলোর কথা যদিও ভাল ক'রে মনে পড়ে না—তবুও তা সে একেবারে ভুলে যায় নি। অতবড় গুণ্ডা জানোয়ার, যার অত্যাচারে সমস্ত আসাম তোলপাড় হয়ে উঠেছে, একটা ছোট্ট শিশুর কাছে সে পোষা বেড়ালের মত শান্ত হয়ে গেল। মহেশ্বর খুকীর গায়ে মাথায় অনেকক্ষণ ধরে শুঁড় বুলালো —চোখ বুজে কত কি ভাব্‌ল—তারপর অতি সাবধানে খুকীকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে বনের পথে ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগল।

মহেশ্বর চলেছে ত' চলেইছে, কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে—নিজেই তা ভাল ক'রে জানে না। খুকীকে নিয়ে কোথায় রাখবে, কি খেতে দেবে মানুষের মত এ সমস্ত ভাবনা তার মনে নেই। তার বন্য প্রকৃতি, তার অভ্যাস, তাকে যে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে সেই দিকেই চলেছে। শেষ পর্য্যন্ত কোথায় পৌঁছবে জানে না।

কিন্তু পথ তার ভুল হয় নি। মংলা যে পথে এসেছিল, সেই পথে সে ফিরে চলল। শিকারী কুকুর যেমন ক'রে গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে শিকার কোন দিক্ দিয়ে পালিয়েছে, মহেশ্বরও ঠিক তেমনি ক'রে মংলার পায়ের গন্ধ ধ'রে ধ'রে চলতে লাগলো, মল্লিক সাহেবের কারখানার বাংলোর দিকে।

খুকী এই কয় দিনে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—তবুও তার ভালই লাগছিল, অন্যদিন যেমন সে হাতী চ'ড়ে বেড়িয়ে বেড়ায় এও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছিল। তার কাছে জঙ্গলের ভয়, মংলার ভয় কিছুই এখন আর নেই। মহেশ্বরেরও মনের মধ্যে এইটুকু সময়ের মাঝে একটা প্রচণ্ড ওলট-পালট হয়ে গেছে। এক সময়ে সে মানুষের আওতায় ছিল। তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে গুণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিশোধ পুরোমাত্রায় নেওয়া হয়েছে, তবুও সে শান্তি পেল না—তাকে গুণ্ডামির নেশায় পেয়ে বসেছিল—এ নেশার শেষ ছিল না। খুকীকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে চলেছে, তার স্পর্শে সে যেন তার অনেক দিনের সেই পুরোনো জীবন ফিরে পেল।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মাথার উপরের ডাল-পালায় বেধে খুকী প'ড়ে যেতে পারে। মহেশ্বর আগে থেকেই তাই ডাল-পালা ভেঙ্গে পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে। একপাল হরিণ পাশ দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল, খুকী খুশী হয়ে হাততালি দিতে লাগ্‌ল।

সতের

খুকীর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। ছোট্ট একটি শিশুর অভাবে অত বড় বাংলোখানা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে—চারিদিকেই একটা অস্বাভাবিক চুপচাপ ভাব। এই ছোট্ট খুকী-টাই সোরগোল ক'রে বাংলোখানা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাতিয়ে রাখে। লোকজন যে যার কাজ করছে, মল্লিক সাহেব বেশী বেশী ক'রে কাজে ব্যস্ত থেকে দুশ্চিন্তা চাপা দিতে চেষ্টা করছিলেন।

আগের দিন রাত্রিতে বীণাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর অনেক বুঝিয়ে তাকে মাত্র একটু দুধ খাওয়ানো হয়েছে। খুকী নেই,—বাঘ-ভালুকে তাকে খেয়ে ফেলেছে এ কথা সে ভাবতেই পারে না। আছে—সে বেঁচে আছে—সে আবার ফিরে আসবে—আবার তেমনি ক'রে হাসবে, তেমনি করে তাকে মা ব'লে ডাকবে—এমনি ধারা নানান্ চিন্তা তার সারা মনটা জুড়ে ব'সে আছে।—এই আশাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—এরপর যত দিন বেঁচে থাকবে এই আশাতেই সে বেঁচে থাকবে।

সময় কারও দিকে চেয়ে দেখে না, কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। দিন যায়, রাত আসে। কত রাজ্যের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা

এক সঙ্গে ভীড় ক'রে অন্ধকার মনের এ-কোণে ও-কোণে উঁকি মারতে থাকে। রাত যায়—দিনের আলোতে তাদের চেহারা ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। কখনও কাজে কর্ম্মে নিজেকে খানিক হারিয়ে ফেলে, কখনও বা খানিক সত্য খানিক স্বপ্ন নিয়ে মানুষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। তারপর যত দিন যায় একটু একটু করে গত জীবনের ঝড়-ঝাপ্‌টা—এমন কি মৃত্যুশোক ভুলতে থাকে।

মল্লিক সাহেবের ইচ্ছে বীণাকে কিছু দিনের জন্যে কলকাতায় তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মাঝে কিছু দিন থাকলে মনের অবস্থা কতকটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু বীণা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। সে কেবলই বলছে—খুকী আছে। আমার মন বলছে সে বেঁচে আছে—সে ফিরে এলে, তাকে নিয়ে কলকাতায় যাব।

তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল। আসামের জঙ্গল,—বাঘ, ভালুক, হাতী, সাপের রাজত্ব। তার মাঝে ছোট্ট একটা শিশু। বেঁচে আছে এ আশা দুরাশা। তবে নাথুরাম যদি শত্রুতা ক'রে তাকে লুকিয়ে রেখে থাকে—একেবারে প্রাণে না মেরে ফেলে থাকে। সেই এক ক্ষীণ আশা।

আশা নিরাশায় কত কথা মনে আস্‌ছে, এমন সময় দূর থেকে একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল। শব্দ ক্রমেই নিকটে আস্‌ছে দেখে, মল্লিক সাহেব বন্দুক হাতে বেরিয়ে গেলেন। বীণা অন্য-মনস্কভাবে একখানা বই নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিল, মল্লিক সাহেবকে বেরিয়ে যেতে দেখে সে-ও বারান্দায় বেরিয়ে এল।

খানিক পরেই জন কয়েক কুলী দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিল, মহেশ্বর আসছে। সমস্ত কুলী-মজুর ভয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। মল্লিক সাহেব দেখ্‌লেন বিপদের উপর বিপদ্। তিনি বীণাকে সাবধান করতে তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে এলেন। বীণা কিন্তু মহেশ্বর আসছে শুনে কিছুমাত্র ভয় পেল না—তার চোখে মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল না।

মিনিট কয়েকের মধ্যে, পর্ব্বতের মত বিরাট্ দেহ নিয়ে মহেশ্বর বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল। লোকজন যারা ভয়ে পালাচ্ছিল তাদের কেউ কেউ তাকে দূর থেকে দেখেছে, বাকী সকলে নাম শুনেই পালিয়েছে। তার ঘাড়ের কাছে যে খুকী বসে আছে তা কারো চোখে পড়ে নি। মল্লিক সাহেবও প্রথমে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারেন নি। মহেশ্বর যে তাঁদের হারানো খুকীকে ফিরিয়ে আনবে, কোনও মতেই এ কল্পনা কেউ ক'রতে পারে না। তিনি বন্দুক হাতে একবার এগিয়ে যাচ্ছেন আবার অন্য দিকে সরে যাচ্ছেন, এমন সময় বীণা "খুকী—খুকী" বলে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে মহেশ্বরের দিকে ছুটে গেল। মল্লিক সাহেব তাকে বাধা দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত পেলেন না।

পরক্ষণেই বীণা তার সেই ছেলে বেলার মতন ক'রে চেঁচিয়ে বল্‌ল—

মহেশ্বর, বৈঠ্—বৈঠ্ যাও—বৈঠ্ যাও—বৈঠ্।

শান্ত শিষ্ট মহেশ্বর নিরীহ পোষা হাতীর মত হাটু গেড়ে ব'সে

খুকী তার উপর থেকে......ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। ৮২ পৃষ্ঠা
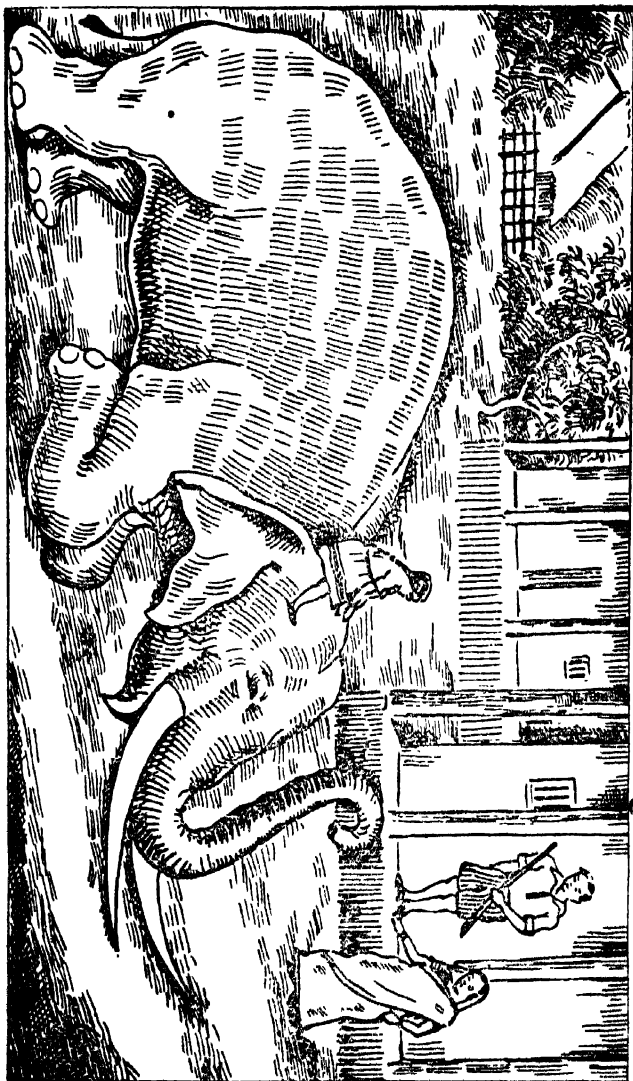
পড়ল। খুকী তার উপর থেকে "মা—মা" ব'লে বীণার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গল্প এখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু নাথুরাম এত কাণ্ড ক'রে, শেষে রাতারাতি আসাম থেকে পালিয়ে বাঁচল—এ খবরটা দেওয়া দরকার। মংলার শাস্তি মহেশ্বর নিজেই দিয়েছে। মহেশ্বর ফিরে এসেছে এ খবর মুখে মুখে ঘণ্টা খানেকের ভিতরে চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ল। নাথুরামও এ খবর পেল। এবার আর কোনও উকিলের কথার মার-প্যাঁচে রেহাই পাবে না। মহেশ্বরকে ধরবার পর তার গায়ে লোহা পুড়িয়ে নাথুরাম যে তার নিজের নাম আচ্ছা ক'রে দেগে দিয়েছিল এখনও তা' স্পষ্ট পড়া যায়। অস্বীকার করবার আর পথ নেই যে, সে মহেশ্বরকে ধরে নি।

জেলখানার হাত এড়ান অসম্ভব দেখে, নগদ টাকাকড়ি গদিতে যা ছিল তাই নিয়ে সে রাতারাতি পালিয়ে গেল। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও তাকে ধরতে পারে নি। হয়ত সে ঐ টাকায় আর কোথাও নাম বদ্‌লে অন্য কোন নামে ব্যবসা আরম্ভ করেছে।

আর, মহেশ্বর? সে চিরকালের মত গুণ্ডামি ছেড়ে দিয়েছে। তাই ব'লে, মানুষের শিকল আর তার পায়ে ওঠে নি—যেমন স্বাধীন ছিল তেমনই স্বাধীন ভাবেই সে জীবন কাটাচ্ছে।

বছরে সে একবার ক'রে মল্লিক সাহেবদের পোষা হাতীর দলে কয়েক মাস কাটিয়ে যায়। তখন সে নিজের খেয়াল-মাফিক

মোটা-মোটা কাঠের গুঁড়ি পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয়। মাহুতের ধার সে ধারে না—নিজেই ভলান্টিয়ার হ'য়ে কাজে লেগে যায়। তাকে এই সময় বিকেল হ'লে মল্লিক সাহেবের বাংলোর উঠোনে দেখা যায়—সে তখন পরম তৃপ্তির সঙ্গে বীণা এবং খুকীর দেওয়া তাল-তাল তেঁতুল খায়। খুকী বস্‌তে বল্‌লে বসে, উঠ্‌তে বল্‌লে উঠে দাঁড়ায়। তার বুকের নীচে দিয়ে খুকী দৌড়াদৌড়ি করে—চার পায়ের আড়ালে লুকোচুরি খেলে। সে তার কান ধ'রে ঝোলে, আস্ত একখানা আখ দিয়ে আচ্ছা ক'রে মার দেয়। আরও কত অত্যাচার করে—মহেশ্বর কিন্তু কিছুই বলে না, বরং তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন তাতে খুব খুশী হয়।

গরম প'ড়ে গেলে মহেশ্বর একটু একটু ক'রে চঞ্চল হতে থাকে। তারপর একদিন আর তাকে দেখা যায় না—সে উত্তর দিকে চলে যায়।

এমনি করে বছরের পর বছর মহেশ্বরের আসা-যাওয়া চল্‌ছিল। সে যখন ফিরে আসে সাড়া প'ড়ে যায় মহেশ্বর ফিরেছে। যখন চলে যায় কেউ জানে না কোথায় কোন্ দেশে সে যায়, আর কেনই-বা যায়।

তারপর, এক বছর সে আর ফিরল না। অসভ্য জংলীদের বিশ্বাস, মহেশ্বর ইন্দ্রের ঐরাবত, হিমালয় পার হয়ে স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেছে—সে মরে নি।

শেষ

এই গ্রন্থকারের——

রেডিও ডাকাত

দাম ॥৵০ আনা

"প্রবাসী" বলেন—এই দুঃসাহসিকতার গল্পগুলি ছেলে-মেয়েদের মনে ধরিবে···সকলেরই ভাল লাগিবে।

"পাঠশালা" বলেন—ইনি (লেখক) ছেলে-মেয়েদের কল্পনাকে রূপ কথায় রাজ্য থেকে টেনে এনেছেন বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক আব-হাওয়ার মধ্যে। তাঁর এই অভিনব প্রচেষ্টা তরুণদের কল্পনারাজ্যে একটা নূতনের আস্বাদ এনে দেবে। বইখানি সচিত্র এবং রচনাও চিত্তাকর্ষক।

"আনন্দবাজার" বলেন—গল্পের নূতনত্ব আছে—ছোট ছেলে-মেয়ে-দের কেন বড়দেরও ভাল লাগিবে। লেখক শিশুচিত্তে দুঃসাহসিকতার আকর্ষণের সহিত বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। চেষ্টা সফল হইয়াছে।

"বঙ্গলক্ষ্মী" বলেন—অতি সরল ও সহজ ভাষায় শিশুদের চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি পাঠ করিলে বালক ও বালিকাদের মন সাহসে ভরিয়া উঠে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

"কৈশোরক" বলেন—বৈজ্ঞানিক মাল-মশলা দিয়া ছোটদের উপ-যোগী গল্প লিখা এক কঠিন ব্যাপার। শৈলেন্দ্রবাবু সেই কঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং সহজ সরল শিশুবোধ্য ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গীর গুণে তাঁহার প্রচেষ্টা অনেকটা সাফল্য-মণ্ডিতও হইয়াছে।

আদি মানুষ

দাম ॥০ আনা

"প্রবাসী" বলেন—সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে সভ্যমানবের পূর্ব্ব-পুরুষ আদিম যুগের মানবের জীবন-যাত্রার এক কাল্পনিক অথচ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে সফল হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া শিশুগণ আনন্দলাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতত্ত্ব বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবে।

"কৈশোরক" বলেন—দুঃসাহসিকতার কাহিনী শিশু-মনকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে। বিশেষ করিয়া কাহিনী প্রকাশের ভঙ্গীটি যদি হয় সুন্দর আর ভাষাটি হয় ঝরঝরে। সে দিক দিয়ে শৈলেন বাবুর 'আদি মানুষ' ত্রুটি হীন। বইখানি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খুবই ভাল লাগিবে। অধিকন্তু গল্পটির মারফতে তাহারা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের অশিক্ষিত অসভ্য আদি মানবের বাসস্থান আচার ব্যবহার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য জানিতে পারিবে।

"যুগান্তর" বলেন—লেখক ভারতের একটি দুর্গম স্থানকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসটি রচনা করিয়াছেন এবং বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছেন। ......বইখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছেলেরা ইহাতে আমোদ পাইবে...... সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আদিম মানবের জীবন ও রীতি-নীতি সম্বন্ধেও কতকটা পরিচয় লাভ করিবে।...বইখানি কিনিয়া পড়িয়া আমোদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবে।